৯

ভীমরাও রামজী আমবেদ্‌কার (১৮৯১-১৯৫৬) [Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956)]

অধ্যায়সূচী

∫∫ (১) ভূমিকা (২) আমবেদ্‌কারের সামাজিক চিন্তা (৩) ধারণা, পদ্ধতি ও মতাদর্শ (৪) জাত ও অস্পৃশ্যতা (৫) আম্‌বেদ্‌কারের ধর্মীয় চিন্তা (৬) আম্‌বেদ্‌কারের আর্থনীতিক চিন্তা (৭) আমবেদ্‌কারের রাজনীতিক ভাবনা (৮) মহাত্মা গান্ধী ও আমবেদ্‌কার ∫∫

৯.১ ভূমিকা (Introduction)

বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ভারতীয় ॥ পুরোনাম ভীম বাও রামজী আমবেদ্‌কার। বিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্ব এই আমবেদ্‌কার। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য সমকালীন ভারতে তুলনারহিত। বিদ্বান ও বিচক্ষণ এই মানুষটি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি মর্যাদামণ্ডিত আসনে আসীন। ভারতীয় জনজীবনের সংকটের সময় এবং অস্থির রাজনীতিক পরিস্থিতিতে সফল সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কারমূলক আন্দোলন আমবেদ্‌কারকে অমর করে রেখেছে। ভারতের বুকে বহু বিদেশি অভিযান এবং বহু শতাব্দীর বিদেশি শাসন এদেশ ও দেশবাসীর প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। এ কথা ঠিক। কিন্তু ভারতের সমাজ জীবনের সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করেছে ইতিহাস ও সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা এবং ধর্মের বিকৃতি। এই কঠোর সত্যটি অনুধাবন করতে আমবেদ্‌কারের অসুবিধা হয়নি। সক্রিয় জীবনের একেবারে গোড়ার দিকেই আমবেদ্‌কারের মধ্যে এ বিষয়ে সম্যক ধারণার সৃষ্টি হয়। তিনি দেখেছেন এ জাতি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই বহুধা বিভক্ত। অসংখ্য স্ববিরোধিতা সূত্রে এ জাতির দুঃখ-কষ্ট অন্তহীন। এই কারণে একটি শক্তিশালী জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা ভারতের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। এ রকম এক প্রতিকূল পরিবেশ পরিমণ্ডলে ভারতের সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয়, আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমবেদ্‌কার আত্মনিয়োগ করেন। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে চরম দুঃখ-দারিদ্র্য এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অমানবিক অন্যায়-অবিচারের শিকার লক্ষ কোটি মানুষ এই মহান মহৎ মানুষটির মধ্যে নতুন আশার আলোর সন্ধান পেয়েছে। ভারতের অগণিত অভাজনের কাছে আমবেদ্‌কার ছিলেন দেবদূত-সদৃশ। তথাকথিত অস্পৃশ্য ও পশ্চাদ্‌পদ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি ছিলেন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। এ দেশের শূদ্র ও অস্পৃশ্য মানবগোষ্ঠীর সমানাধিকারের দাবিকে সর্বসমক্ষে তিনি তুলে ধরেছেন। ভারতে জাতভেদ প্রথার ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত 'মনুস্মৃতি'র বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তা ছাড়া স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল নেতৃত্বমূলক। অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা তাঁর *Modern Indian Political Thought* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "As one of the prime architects of the text of the Indian Constitution and as an outspoken militant champion of the aspirations and claims to equality of the so-called untouchables, Ambedkar has won undying recognition..... His books on Indian sociology touching upon the problems of the Shudras, the untouchables etc., breathe a note of deep realism and are also characterised by bitter denunciations of the old law-givers, some of whom like Manu, poured forth words of contempt and bitterness against the suppressed sections of the Hindu Society."

মাহার পরিবারে জন্ম ॥ আমবেদ্‌কারের জন্ম মহারাষ্ট্রের মাহার সম্প্রদায়ের এক নিম্নবর্ণের পরিবারে। দাবি করা হয় যে এই মাহার সম্প্রদায়ই হল মহারাষ্ট্রের আদি অধিবাসী। মাহারদের রাষ্ট্র হিসাবে এই অঞ্চলের নাম হয়েছে মহারাষ্ট্র। কিন্তু বর্ণ-হিন্দুরা মহারাষ্ট্রে মাহারদের উপর অস্পৃশ্যতার নানারকম অক্ষমতা আরোপ করে। আমবেদ্‌কারের জন্ম হয় ১৮৯১ সালের এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে। বাবার নাম রামজী মালোজী আমবেদ্‌কার এবং মায়ের নাম ভীমাবাই। ভীমরাও রামজী আমবেদ্‌কার হলেন পিতামাতার চতুর্দশ ও কনিষ্ঠ সন্তান। পিতৃপুরুষের বসবাস ছিল রত্নগিরি জেলার একটি গ্রামে। গ্রামটির নাম আম্বাভাতে। গ্রামের নামের পরিপ্রেক্ষিতে আমবেদ্‌কার পদবীটির ব্যবহার শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শৈশবে তিনি

ভীম সকপাল (Bhim Sakpal) এবং তাঁর বাবা রামজী সকপাল (Ramji Sakpal) নামে পরিচিত ছিলেন। রামজী সকপাল সন্ত কবীর-এর অনুগামী ছিলেন। আমবেদ্‌কারের পিতা ও পিতামহ ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছেন। স্বভাবতই আমবেদ্‌কার-পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও নিম্নবর্গের মাহার সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার জন্য পরিবারের সদস্যদের উপর বহুবিধ অক্ষমতা আরোপ করা হত। কারণ মহারাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থা ছিল বর্ণ ও জাতপাতের ভিত্তিতে ক্রমস্তরবিন্যস্ত। মাহার পরিবারে জন্মের ঘটনাটি আমবেদ্‌কারের শৈশব, কৈশোর এবং পরবর্তী জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

জাতগত বৈষম্যের শিকার ॥ শৈশব থেকে লেখাপড়ায় আমবেদ্‌কারের আগ্রহ ছিল অগাধ। পিতা রামজী ছিলেন শিক্ষানুরাগী। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র আমবেদ্‌কারের বিদ্যার্জনের জন্য সাধ্যমত সুবন্দোবস্ত করেন। মাহার পরিবারে জন্মের কারণে ছাত্রজীবনের শুরু থেকে আমবেদ্‌কারকে জাত-পাতের বিভেদ-বৈষম্যের শিকার হতে হয়। জাতভেদজনিত অমানবিক বৈষম্যমূলক আচার-আচরণ আমেবদ্‌কারের মনে নিদারুণ তিক্ততার সৃষ্টি করে। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসের সূত্রপাত করতে গিয়েই আম্‌বেদ্‌কার অচিরেই অনুধাবন করেন যে, বিশেষ একটি সম্প্রদায়ে জন্মের ঘটনাই ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা এবং অন্য সকলের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। স্কুলের ক্লাসে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে বসার সুযোগ তিনি পেতেন না। বসার জন্য চটের থলে বাড়ি থেকেই তাঁকে নিয়ে যেতে হত। স্কুলে তাঁকে পানীয় জল দেওয়া হত না। খেলাধূলায় তিনি অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় শিক্ষকমশায়রাও আমবেদ্‌কারের খাতাপত্র ছুঁতেন না। এইভাবে অতি শৈশবেই স্তরবিন্যস্ত হিন্দু সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর মন বিশেষভাবে বিষিয়ে যায়।

কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্রজীবন ॥ বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ও অমানবিক আচরণের যাবতীয় বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে আমবেদ্‌কার তাঁর লেখাপড়ার চর্চা চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে প্রথমে তাঁকে ভর্তি করা হয় স্থানীয় একটি মারাঠী বিদ্যালয়ে। তারপর তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সম্পাদিত হয় সাতরায় একটি সরকারি বিদ্যালয়ে। তখন তিনি ন'বছরের বালক। তাঁর স্কুলের শিক্ষা অল্প বয়সেই সমাপ্ত হয়। তারপর তিনি মুম্বাই-এর অভিজাত কলেজ এলফিন্‌স্টোন-এ ভর্তি হন। এই সময় তিনি বরোদার মহারাজার উৎসাহ ও আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেন। ১৯১২ সালে আমবেদ্‌কার কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। ইতিমধ্যে তিনি পিতাকে হারিয়েছেন। কিন্তু পিতৃবিয়োগ তাঁর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বিদেশে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন সেই বরোদার মহারাজাই। এ বিষয়ে আমবেদ্‌কারের সৌভাগ্য অনস্বীকার্য। মহারাজার সঙ্গে তাঁর এই মর্মে চুক্তি হয় যে বিদেশে উচ্চশিক্ষা শেষে তিনি বরোদায় অন্তত দশ বছর চাকরি করবেন। ১৯১৩ সালে আমবেদ্‌কার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের কোলাম্‌বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ভিন্নতর সামাজিক পরিবেশ-পরিমণ্ডলে আমেরিকায় আমবেদ্‌কারের উচ্চশিক্ষা শুরু হল। তাঁর জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই স্বর্ণ-সুযোগের তিনি সম্যক সদ্ব্যবহার করেছেন। অনতিবিলম্বে ১৯১৫ সালে কোলাম্‌বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছরই কোলাম্‌বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর গবেষণার স্বীকৃতি-স্বরূপ তাঁকে ডক্‌টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। গবেষণার বিষয়টি ছিল *The National Divident for India — A Historical and Analytical Study.* পরবর্তীকালে ১৯২৭ সালে আর একটি সফল গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য কোলাম্‌বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। এ ক্ষেত্রে গবেষণামূলক গ্রন্থটির নাম হল *The Evolution of the Provincial Finance in India.* অতঃপর আমবেদ্‌কার বছর চারেক দেশে কাটান। এই চার বছরের কর্মবহুল জীবনেও তাঁকে জাতভেদ প্রথার প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অর্থনীতি নিয়ে অধিকতর অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় বিদেশে পাড়ি দেওয়া মনস্থ করেন। এই সময় কোলাপুরের উদারহৃদয় মহারাজা শাহু ছত্রপতি আমবেদ্‌কারকে আর্থিক আনুকূল্য প্রদান করেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌স' এই বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যায়তনে তিনি ভর্তি হন। এই সময় তিনি গবেষণামূলক অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর *Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India* শীর্ষক গবেষণামূলক রচনাটি গ্রহণ করে এবং ১৯২১ সালে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এম.এস-সি. ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯২৩ সালে তিনি *The Problem of the Rupee — its origin and its solution* শীর্ষক থিসিসটি পেশ করেন। এই গবেষণামূলক রচনাটির জন্য তাকে অর্থনীতিতে ডি. এস-সি. ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে তিনি ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য গ্রের ইন-এ ভর্তি হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্য লাভ করেন। এইভাবে বিদেশে তাঁর কতৃত্বপূর্ণ ছাত্রজীবন সম্পূর্ণ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের সংবিধান প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কোলাম্‌বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমবেদ্‌কারকে এল.এল.ডি. উপাধিতে ভূষিত করে। এটিই হল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সর্বোচ্চ উপাধি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়েও আমবেদ্‌কার অর্থনীতি নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। ১৯২৩ সালে আমবেদ্‌কার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তিনি তিরিশ বছরের যুবক। অর্থনীতির পণ্ডিত আমবেদ্‌কারের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি রাজনীতিবিদ হিসাবে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন এবং আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। আবার সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও তাঁর ভূমিকা তাঁকে মর্যাদামণ্ডিত করেছে।

কর্মজীবন ॥ আমবেদ্‌কারের কর্মজীবনও অতিমাত্রায় কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। বরোদার মহারাজার সঙ্গে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আমবেদ্‌কার ১৯১৭ সালে বরোদা রাজ্য কৃত্যকে যোগদান করেন। কিন্তু বরোদা রাজ্যে তাঁর চাকরির অভিজ্ঞতা বিষাদময়। অচ্ছুৎ মাহার সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার জন্য সহকর্মীদের কাছ থেকে তিনি সম্মানজনক ব্যবহার পেতেন না। অধস্তন কর্মচারীরা তাঁকে খাবার জল দিত না এবং তফাতে থেকে ফাইলপত্র তাঁর টেবিলে ছুঁড়ে দিত। এ বিষয়ে মহারাজার কাছে তিনি অভিযোগ করেছেন। কিন্তু এ রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিবর্তন করা সহজ ছিল না। নিদারুণ হতাশা ও বিরক্তিতে তিনি মাস পাঁচেকের মধ্যে বরোদা ছেড়ে মুম্বাই চলে আসেন। এখানে প্রথম কিছু দিন ব্যবসা-পত্র শুরু করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করা। তারপর ১৯১৮ সালে আমবেদ্‌কার মুম্বাই-এর সিডেনহাম কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার কারণে আমবেদ্‌কার অনতিবিলম্বে সহকর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু কলেজে উচ্চবর্ণের সহকর্মীদের আপত্তিকর আচরণ তাঁকে আহত করে। ব্যথিত চিত্তে ১৯২০ সালে তিনি কলেজ অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দেন। আইন ও অর্থনীতিতে অধিকতর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে আমবেদ্‌কার আবার বিদেশে পাড়ি দেন। যাই হোক মন্টফোর্ড সংস্কার আইন প্রণীত হওয়ার প্রাক্কালে আমবেদ্‌কার অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী এবং জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের দাবি জানান। হোমরুল দাবি করার আগে তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ ॥ ভারতের অনুন্নত অস্পৃশ্য মানবগোষ্ঠীর উপর আরোপিত সুদীর্ঘকালের অক্ষমতাসমূহ অপসারণের জন্য আমবেদ্‌কার আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি সম্ভাব্য সকল রকম উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সংখ্যালঘু ও অচ্ছুৎ মাহার সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক নিগ্রহ-নিপীড়ন চালাত। পুকুরের জল ব্যবহার করতে দিত না। হিন্দুদের এই সামাজিক নিগ্রহের প্রতিবাদে আমবেদ্‌কার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সামিল হন। ভারতের পশ্চাদ্‌পদ মানবগোষ্ঠীর দুঃখ-যন্ত্রণা এবং দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে তিনি সম্পাদক হিসাবে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। এই পত্রিকাটির নাম হল 'বহিষ্কৃত ভারত'। তা ছাড়া আরও একটি পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশনার তিনি ব্যবস্থা করেন। এই পত্রিকাটির নাম হল 'জনতা'। শুধু অস্পৃশ্য মাহার সম্প্রদায়ই নয়, দেশের সকল পশ্চাদ্‌পদ জনসম্প্রদায় তাদের সাংগঠনিক উদ্যোগে এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে আমবেদ্‌কারের আন্তরিক ও সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেছে। বিভিন্ন অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সংঘ-সমিতির সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। মেহনতী মানুষের স্বার্থের সহায়ক আন্দোলনসমূহের তিনি সামিল হয়েছেন। তিনি 'স্বাধীন শ্রমিক দল' নামে একটি দলও গঠন করেন। আমবেদ্‌কারের উদ্যোগে ১৯২৪ সালে অচ্ছুৎ ও অনুন্নত জনসম্প্রদায়ের মানুষজনকে নিয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটির নাম হল 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা'। দেশের ভিতরে ও বাইরে অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। সনাতন হিন্দুধর্ম ও ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং বিভেদমূলক আচার-আচরণ, গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন। এক সময় ১৯৩৫ সালে আমবেদ্‌কার হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল আন্তরিক। তিনি ১৯৫১ সালে ভারতের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে একটি সংঘ গঠন করেন। এই সংঘটির নাম হল 'ভারতীয় বৌদ্ধ জনসংঘ'। বৌদ্ধধর্মের সংঘ-সংগঠনসমূহের সঙ্গে তাঁর সংযোগ-সম্পর্ক ছিল। এই ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য আমবেদ্‌কার দেশের ভিতরে ও বাইরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

বৃহত্তর রাজনীতিক কর্মকাণ্ড ॥ আমবেদ্‌কার সারা জীবন ধরে তিনটি বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এই তিনটি বিরুদ্ধ শক্তি হল সনাতন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভ্রান্ত রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের শাসন-শোষণ। ভারতের মূল জাতীয় জীবনধারা থেকে কয়েকটি জনগোষ্ঠী কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনগ্রসর ও অচ্ছুৎ হয়ে পড়ল এ বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধানের অন্ত ছিল না। ভারত ও ভারতবাসীর এই মৌলিক সমস্যার সূত্রাদির সন্ধানে এবং সমাধানের পথ অন্বেষণে আমবেদ্‌কার আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষা ও শিক্ষাগত দাবি-

দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। দেশ ও দেশবাসীর ঐক্য, সংহতি ও স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠিত করার পরিকল্পনা করেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের সমকালীন নেতৃত্ব এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে অনেক বিষয়েই আমবেদ্‌কারের মতামতের অমিল ছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কিত খসড়া-কমিটির সভাপতি ছিলেন আমবেদ্‌কার। ভারতের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমবেদ্‌কারের ভূমিকা ছিল স্থপতিসুলভ। পশ্চাদ্‌পদ ও দুর্বল জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য সংবিধানে সংরক্ষণমূলক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে আমবেদ্‌কারের অবদান অনস্বীকার্য। অনেকে তাঁকে ভারতের সংবিধানের জনক বলার পক্ষপাতী। বিদেশি ব্রিটিশ সরকারও তাঁর মতামতকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আমবেদ্‌কার স্বাধীন ভারতে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিলেন। তিনি জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন। বস্তুত আমবেদ্‌কারের রাজনীতিক কর্মকাণ্ড ছিল অতিমাত্রায় বিস্তৃত। ভারতমাতার এই কৃতি সন্তানের জীবনাবসান ঘটে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে।

মার্কিন রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাবলীর প্রভাব ॥ আমবেদ্‌কারের জীবন, কর্ম ও মতাদর্শের উপর বিবিধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জীবনদর্শন, কার্যপ্রক্রিয়া ও মানসিক গঠন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে এদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবন, বাণী ও মতাদর্শের দ্বারা। বিদেশি রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এবং শাসনতান্ত্রিক চিন্তাধারা আমবেদ্‌কারের ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করেছে। ছাত্রাবস্থায় বেশ কিছুদিন তাঁর মার্কিন মুলুকে কেটেছে। এই সময় সাংবিধানিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত জেফারসন ও ম্যাডিসনের বিবিধ লেখাপড়ার এবং বক্তৃতা শোনার সুযোগ তাঁর হয়েছে। এই সমস্ত রচনা ও বক্তৃতার প্রভাব তাঁর উপর পড়েছে। তা ছাড়া অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা আমবেদ্‌কারকে আকৃষ্ট করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরিউল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের রচনাবলী ও বক্তৃতা কার্যকরভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছে। অনুরূপভাবে সমকালীন মার্কিন ইতিহাসের একটি আর্থ-রাজনীতিক আন্দোলনও আমবেদ্‌কারকে অবধারিতভাবে প্রভাবিত করেছে। এটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগৃহীত নিগ্রোদের আন্দোলন। মার্কিন নিগ্রোদের এই আন্দোলন ছিল আর্থনীতিক ও রাজনীতিক প্রকৃতির। সুতরাং মার্কিন রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাবলীর প্রভাব আমবেদ্‌কারের উপর পড়েছে।

ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিকদের প্রভাব ॥ পরবর্তীকালে আমবেদ্‌কার উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন। অর্থনীতিতে স্নাতক ছাত্র হিসাবে তিনি 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স ও পলিটিক্যাল সায়েন্স'-এ ভর্তি হন। লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় তিনি বিভিন্ন বিখ্যাত রাষ্ট্রদার্শনিক ও সংবিধান-বিশেষজ্ঞের সংযোগ-সংস্পর্শে আসেন। এই সমস্ত বিশ্ববন্দিত চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হ্যারল্ড ল্যাস্কি, আর্নেস্ট বার্কার, এ.ভি.ডাইসি, আইভর জেনিংস প্রমুখ। এঁদের রচনাবলী এবং বক্তৃতা আমবেদ্‌কারের রাজনীতিক মতাদর্শকে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদার্শনিকদের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছেন।

ভারতীয় মনীষীদের প্রভাব ॥ আমবেদ্‌কারের উপর বিদেশি চিন্তানায়কদের প্রভাব যেমন পড়েছিল, তেমনি ভারতীয় চিন্তাবিদ ও ইতিহাসের গতিধারার প্রভাব পড়েছিল। শৈশব ও কৈশোরে আমবেদ্‌কারের আগ্রহ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতেও পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবণতা আমবেদ্‌কারের মধ্যে আজীবন অব্যাহত ছিল। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র এবং রামায়ণের রামচন্দ্র, তাঁদের অতিমানবিক ক্রিয়াকলাপ আমবেদ্‌কারকে অভিভূত করেছে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মানবিক সম্পর্কসমূহের ইতিহাস গভীরভাবে তিনি অধ্যয়ন করেছেন। ভারতের বিভিন্ন মনীষীর মানবিক চিন্তা, লোকায়ত ধ্যান-ধারণা এবং ভক্তিবাদ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এ প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ, কবীর, মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে, রামানন্দ, মহাদেও রানাডে, গোপাল গণেশ সাভারকার প্রমুখ মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত মহামানবের উদার সংস্কারবাদী ভূমিকার দ্বারা আমবেদ্‌কার আপ্লুত হয়েছেন। সামাজিক সাম্য সম্পর্কিত উদারনীতিক সংস্কারবাদী আন্দোলন আমবেদ্‌কারকে অভিভূত করেছে।

বুদ্ধের জীবন ও বাণীর প্রভাব ॥ ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী আমবেদ্‌কারকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছে। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় উদারনীতিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত ও সম্পাদিত হয়েছে ভগবান বুদ্ধের সদর্থক ও সক্রিয় ভূমিকার দ্বারা। এই সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তিতেই ভারতে রাজনীতিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। বস্তুত সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে ভগবান বুদ্ধের আমলে। আমবেদ্‌কার এই আন্দোলনকে ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বুদ্ধের সংস্কার আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়েছিল, এ কথা ঠিক। কিন্তু এই আন্দোলন সামাজিক ও রাজনীতিক বিপ্লবে পরিণতি লাভ করেছিল। এই কারণে আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম হল একটি মহান বিপ্লব। সকলের জন্য ভালবাসার মহান আদর্শের কথা প্রচার করেছেন ভগবান বুদ্ধ। তিনি

অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন। জনসাধারণ অহিংসাকে জীবনধারার অংশ হিসাবে মেনে নিয়েছে। ত্রিপিটকে বলা হয়েছে যে যথার্থ ধর্ম মানুষের হৃদয়েই বর্তমান, শাস্ত্রসমূহের মধ্যে নয়। মানুষ এবং নৈতিকতাই হল ধর্মের মর্মবস্তু। ত্রিপিটকের মর্মবাণীর দ্বারা আমবেদ্‌কার বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধ চতুর্বর্ণের বিরুদ্ধে বলেছেন। মহিলারা এবং শূদ্ররা সন্ন্যাসী হতে পারবে না, এই ধারণারও তিনি বিরোধিতা করেছেন। হিন্দু সমাজব্যবস্থার জাতভেদ প্রথাকে একটি পবিত্র প্রথা হিসাবে শাস্ত্রসমূহে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ এই সমস্ত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন।

কবীরের প্রভাব ॥ মধ্যযুগে কবীরও হিন্দু সমাজের জাতভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উদারনীতিক সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। জাতভেদ প্রথার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তিনি সকলকে অবহিত করার চেষ্টা করেছেন। এই জাতভেদ প্রথা হিন্দু সমাজব্যবস্থার কি অপূরণীয় ক্ষতি করেছে সে বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অন্যান্য সাধু-মহাত্মা এবং সুফী সন্ন্যাসীরাও সর্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলেছেন, মানুষের জন্য ভালবাসার কথা বলেছেন। তবে কবীরের জীবন ও বাণী আমবেদ্‌কারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

জ্যোতিবা ফুলের জীবন ও বাণীর প্রভাব ॥ মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে (Jyotiba Phooley)-র জীবন ও বাণী আমবেদ্‌কারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। আমবেদ্‌কার সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করতেন। এ বিষয়ে মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের বাণী ও অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য। মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের প্রতি শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি হিসাবে আমবেদ্‌কার তাঁর *Who Were the Shudras* শীর্ষক গ্রন্থটি মহাত্মা ফুলের প্রতি উৎসর্গ করেন। তাঁর মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে রাজনীতিক আন্দোলনের থেকে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন অধিকতর মৌলিক প্রকৃতির এবং অপরিহার্য। কারণ সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ব্যতিরেকে রাজনীতিক আন্দোলনের সাফল্য সুনিশ্চিত হতে পারে না। জ্যোতিবা ফুলে হলেন উনবিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট ধর্মযোদ্ধা। কোলাপুরের মহারাজা শাহু ছত্রপতি জ্যোতিবাকে মহারাষ্ট্রের মার্টিন লুথার হিসাবে অভিহিত করেছেন। মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সৃষ্টি করেছেন। নারী জাতি ও অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। মহিলাদের জন্য ১৮৪৮ সালে এবং তথাকথিত অচ্ছুৎ জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য ১৮৫১ সালে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাতভেদ প্রথার কারণে হিন্দুসমাজের সকলের জন্য সাধারণ মানবাধিকার স্বীকৃত ছিল না। এই কারণে ফুলে জাতভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। সামাজিক সাম্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য ১৮৭৩ সালে 'সত্যশোধক সমাজ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনটি আদর্শ প্রচারের উপর তিনি জোর দেন। এই তিনটি আদর্শ হল: **এক,** ঈশ্বর অভিন্ন এবং সকল জীবই তাঁর সৃষ্টি; **দুই,** ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যবর্তী কোন ব্যক্তির উপস্থিতি অপ্রয়োজনীয় এবং **তিন,** মানুষের মহত্ত্ব জন্মের উপর নির্ভরশীল নয়, জাতগত বিচার-বিবেচনা অর্থহীন।

আম্‌বেদ্‌কার বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা বেশ কিছু গ্রন্থ কালপযোগী এবং উচ্চ প্রশংসিত। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমবেদ্‌কারের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম হল *The Castes in India.* ভারতের বর্ণব্যবস্থার উপর এটি রচিত। কোলাম্‌বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসাবে তিনি এই প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। তাঁর শেষ রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনাবসানের পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালে। এই গ্রন্থটির নাম হল *The Buddha and His Dhamma*। জীবদ্দশায় প্রণীত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি হল: *Annihiliation of the Caste, The Problem of the Rupee, Pakistan or Partition of India, States and Minorities, Ranade, Gandhi and Jinnah, Who were the Shudras?, What Congress and Gandhi have done to the Untouchables?* প্রভৃতি। ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা তাঁর *Modern Indian Political Thought* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "In the history of modern Indian political thought, Ambedkar will have a significant place because through his scholary writings, speeches, leadership and constructive work, he made significant the awareness of the political, economic and social problems of the vast untouchable community ....."

৯.২ আমবেদ্‌কারের সামাজিক চিন্তা (Social Thought of Ambedkar)

দলিত মানুষের প্রতিনিধি ॥ ভারতের ইতিহাসে অনগ্রসর ও অবহেলিত জনসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে আমবেদ্‌কার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্যে এবং বৌদ্ধিক বিচক্ষণতায় আমবেদ্‌কার বিশিষ্ট।

এই সুবাদে ভারতব্যাপী, বিশেষত মহারাষ্ট্রে সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত এই ভারতীয় জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র স্বার্থ সংরক্ষণ ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তা করেছেন। পিছিয়ে-পড়া এই সমস্ত জনসম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি রাজনীতিক ও আর্থনীতিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সুসংহত উদ্যোগ-আয়োজনের উপর জোর দেন। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারমূলক বিভিন্ন আইন প্রণয়নের প্রাক্কালে আমবেদ্‌কার রাজনীতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন। অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য তিনি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। সমকালীন ভারতের অচ্ছুৎ শ্রেণীসমূহের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উপযোগী উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের নির্বিকার ভূমিকায় তিনি ছিলেন ক্ষুব্ধ। ব্রিটিশ সরকারের এই নির্লিপ্ততার বিরুদ্ধে আমবেদ্‌কার প্রতিবাদী সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। ১৯৩০ সালে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে রায় বাহাদুর শ্রীনিবাসনের সঙ্গে আমবেদ্‌কার অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। আমবেদ্‌কার ছিলেন ভারতের দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই পিছিয়ে-পড়া মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতা বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা তাঁর *Modern Indian Political Thought* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Dr. Ambedkar was a social prophet of the Untouchables. He denounced the monstrous iniquities and outrageous calumnies which Brahmanical Hinduism has heaped upon the Untouchables and the bitterness of his fury against Hinduism is apparent in his works."

জাতভেদ প্রথা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্করহিত ॥ আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে জাতগত স্তরবিন্যাস সামাজিক ও আর্থনীতিক বিচার-বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতভেদ প্রথাকে ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার সঙ্গে সংযুক্ত করা অনুচিত। জাতভেদ প্রথাকে ধর্মীয় সমর্থন প্রদান হিন্দুধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্করহিত। জাতভেদ ব্যবস্থা হিন্দুধর্মের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক নয়। হিন্দুদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না, বেদকে মানেন না; অথচ তাঁরা নিজেদের হিন্দু হিসাবে পরিচয় দেন। সামাজিক একটি বিশেষ শ্রেণীকে ধর্মীয় ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেওয়ার ফলে হিন্দু জনসম্প্রদায়ের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। দলিত শ্রেণীর বহু মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাঁরা খ্রিস্টান ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাতভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতামূলক আচরণ ভারতীয়দের এবং ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমবেদ্‌কারের এই অভিমত ভারতীয়দের বিবেকবোধকে নাড়া দিয়েছে।

জাতভেদ প্রথার বিরোধিতা ॥ আমবেদ্‌কারের মতানুসারে ভারতে জাতভেদ প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত সামাজিক স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের স্তরবিন্যাস সমাজজীবন বা জনজীবনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। কারণ হিন্দু সমাজব্যবস্থায় সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়ম-নিষেধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। তার ফলে ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রবণতা পদদলিত হয়। ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মানব সমাজ গঠিত এ ধারণা গতানুগতিক। আসলে সমাজ গঠিত হয় বিভিন্ন শ্রেণীকে নিয়ে। সামাজিক, আর্থনীতিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সমাজের প্রত্যেকেই এ রকম কোন-না-কোন শ্রেণীর সদস্য। এই ব্যবস্থা ব্যতিক্রমহীন। কিন্তু হিন্দু সমাজে এই শ্রেণীবিন্যাস জাতভেদ প্রথায় পরিণতি লাভ করেছে। আদিতে জাত ছিল একটাই। কালক্রমে অনুকরণ ও বহিঃস্করণের মাধ্যমে শ্রেণীসমূহ বিভিন্ন জাতে পরিণত হয়েছে। শ্রমবিভাজনের ব্যবস্থা ও নীতি সকল সভ্য সমাজেই স্বীকৃত। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু হিন্দু সমাজে জাতভিত্তিক শ্রমবিভাজনের ব্যবস্থাকে একটি অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছে। হিন্দু সমাজে এক-একটি জাত স্বতন্ত্র একটি সাংস্কৃতিক এককে পরিণত হয়। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে হিন্দু সমাজের জাতভেদ প্রথার এই চেহারা চরিত্র অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

সমানাধিকারের অস্বীকৃতি ॥ জাত-পাতভিত্তিক হিন্দু সমাজব্যবস্থার পিছনে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুমোদন বর্তমান। হিন্দু সমাজের দুর্বলতার মূল কারণ এর মধ্যেই নিহিত আছে। এই কারণে খ্রিস্টান ও মুসলমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজের দুর্বলতা প্রতিপন্ন হয়। হিন্দু সমাজের এক শ্রেণীর মানুষকে যাবতীয় মানবিক অধিকার থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের উপর যাবতীয় দায়িত্ব পালনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অস্পৃশ্যতার ছাপ লাগিয়ে দিয়ে তাদের জন্য সকল রকম মানবিক সুযোগ-সুবিধাকে অস্বীকার করা হয়েছে। হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষেরা সকল রকম সুযোগ-সুবিধা, বিশেষাধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আবার সমাজের তথাকথিত অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের মানুষের উপর

সকল রকম অন্যায় ও অমানবিক আচরণের অধিকারও ভোগ করে। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে হিন্দু ধর্ম সর্ব বিষয়ে বিশেষভাবে উদার প্রকৃতির। অথচ এই ধর্মে অস্পৃশ্য বলে সমাজের একটি শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে। সমাজের একটি শ্রেণীকে এইভাবে অচ্ছুৎকরণের বিষয়টি হিন্দু ধর্মের অনুমোদন লাভ করেছে। অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত এই শ্রেণীটির ব্যক্তিবর্গকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে তারা মেলামেশার অযোগ্য বলে মনে করা হয়। হিন্দু সমাজে এইভাবে চ্ছুত-অচ্ছুৎ বিভাজন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক । সামাজিক ও আর্থনীতিক বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণীবিন্যাস পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায়। মানবসমাজের শ্রেণীভিত্তিক গঠন নতুন কোন বিষয় নয়। সকল দেশের সমাজব্যবস্থার সাংগঠনিক ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বিন্যাস বর্তমান। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু হিন্দু সমাজব্যবস্থায় জন্মগত বিচারে শ্রেণীবিন্যাস বর্তমান। এবং এই শ্রেণীবিভাজন ধর্মীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত। হিন্দু সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের পিছনে ধর্মীয় অনুমোদনের উপস্থিতি সমগ্র বিষয়টিকে অধিকতর জটিল করে তুলেছে। হিন্দু ধর্মই সমাজের সকলের মুক্ত জীবনযাপন এবং সামাজিক সচলতার পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। এই হিন্দু ধর্মই সমাজের কিছু মানুষকে অচ্ছ্যুৎ বলে চিহ্নিত করে দিয়েছে এবং সমাজে সমানাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। হিন্দু সমাজের জাতভেদ প্রথা ধর্মীয় অনুমোদনের ভিত্তিতে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। শিক্ষার বিস্তার, সামাজিক সংস্কার বা সাম্যের শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এই জাতভেদ প্রথার অবলুপ্তি অসম্ভব।

জাতভেদ প্রথার প্রাধান্য ॥ হিন্দু সমাজব্যবস্থায় সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব একেবারে অনুপস্থিত। অসাম্যের ভিত্তিতে এই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। সামর্থ্য ও গুণগত যোগ্যতা নির্বিশেষে এই সমাজে জাতগত বিচারে ব্যক্তির বৃত্তি নির্ধারিত হয়। এবং জাতগত বিচারে বৃত্তির এই বিন্যাস অপরিবর্তনীয়। সামাজিক জীবনে অসাম্যই হল হিন্দু সামাজিক সংগঠনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তির স্বাধীনতা এ ক্ষেত্রে অস্বীকৃত। বলা হয় যে প্রজাপতি ব্রহ্মা সকল মানুষের স্রষ্টা। এতদ্‌সত্ত্বেও হিন্দু সামাজিক সংগঠনে সাম্যের নীতি অস্বীকৃত। হিন্দু সমাজে ব্যক্তি-মানুষের বৌদ্ধিক ও প্রকৃতিগত স্বাভাবিক পার্থক্যের উপর কোনরকম গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। মানুষের জন্মগত বা জাতগত পার্থক্যের উপর যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। হিন্দু ধর্মের ভাষ্য অনুসারে ঈশ্বরই সকলের স্রষ্টা, কিন্তু সকলকে তিনি সমান করে সৃষ্টি করেননি। সামাজিক জীবনে অসাম্য হল হিন্দু সামাজিক সংগঠনের মৌলিক নীতি। এখানে বর্ণ ও জাত ব্যবস্থার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এখানে বর্ণ ও জাতের গুরুত্বই অধিক। আদিতে ছিল চতুর্বর্ণ। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে হয়েছে পাঁচ। অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায় পঞ্চম বর্ণ হিসাবে সংযুক্ত হয়েছে। প্রতিটি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত জাতগোষ্ঠীসমূহ আবার বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বিভিন্ন বিভাজন বর্তমান। বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-প্রকরণ, বৈবাহিক বিধি-ব্যবস্থা, খাদ্যাখাদ্যের বাছ-বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই হিন্দুরা একটি সুসংহত জনসম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। জাতভেদ প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সমাজে ব্যক্তি-মানুষের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষাধিকারসমূহ জাতগত বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়; মানুষের সামর্থ্য-অসামর্থ্য বা গুণগত যোগ্যতা-অযোগ্যতা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন হয়।

সামাজিক অস্বীকৃতি ॥ হিন্দু সমাজের এই জাতভেদ প্রথা সংরক্ষণেরও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অতীতে ছিল। বর্ণ ও জাতগত ভিত্তিতে স্তরবিন্যস্ত সামাজিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের দায়িত্ব নৃপতিদের উপর ন্যস্ত ছিল। নিচু জাতের মানুষ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করতে পারত না, অথবা অস্ত্র ধারণ করতে পারত না। নিচু জাতের এই মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থান ও মর্যাদা চিরকালের জন্য স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ছিল। কোনরকম পরিবর্তন বা সমালোচনার সুযোগ ছিল না। অর্থাৎ জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু মানুষের উপর অসামর্থ্যসূচক কিছু অক্ষমতা চিরকালের জন্য আরোপ করা হয়। হিন্দু সামাজিক সংগঠনের এই ব্যবস্থাকে ঈশ্বরীয় ও পবিত্র ব্যবস্থা হিসাবে মান্য করার কথা বলা হয়। সামাজিক সচলতার পথ এ ক্ষেত্রে একেবারে অবরুদ্ধ।

হিন্দু সমাজের ধারণা সঠিক নয় ॥ আমবেদ্‌কার হিন্দু সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করেছেন। হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত তাঁর এই অনুশীলন বিষয়গত এবং নির্মোহ প্রকৃতির। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু সমাজ হিসাবে কোন কিছুর পরিচয় পাওয়া যায় না। আসলে হিন্দু সমাজ হল বেশ কিছু জাতগোষ্ঠীর সমাহার বিশেষ। এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জাতগোষ্ঠী নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সতত সচেতন। হিন্দু সমাজ হল জাতসমূহের এক ব্যবস্থা বিশেষ। এই ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিটি জাতের বিভিন্ন অধিকার ও উদ্দেশ্য বর্তমান। সুতরাং হিন্দুদের সমাজ হিসাবে অভিহিত করা

যায় না। সমাজ হবে ব্যক্তিবর্গের একটি সংগঠিত ব্যবস্থা এবং সমাজের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকবে। হিন্দু সমাজের মধ্যে তা নেই। হিন্দু সমাজের তাত্ত্বিক আদর্শ এবং বাস্তব জীবনধারার মধ্যে বিশেষ ব্যবধান বর্তমান। হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতি উন্নত মূল্যবোধ ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সদ্ভাব-সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা, মানবিকতা, অহিংসা, মানবসেবা প্রভৃতি এই সমাজ-সংস্কৃতির মূল কথা। তাত্ত্বিক অনুমোদন সত্ত্বেও সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ন্যায়, স্বাধীনতা ও সাম্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। হিন্দুদের সামাজিক জীবনে অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। তাত্ত্বিক আদর্শ ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান হিন্দু সমাজের দুর্বলতা ও দুর্দশার মূল কারণ। এই কারণেই সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দুদের বিদেশি শক্তির পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে।

অস্পৃশ্যদের উপর অবিচার ॥ আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী হিন্দু আইনে কোন অচ্ছুৎকে ব্যক্তি হিসাবে স্বীকার করা হয় না। হিন্দু ধর্মে অস্পৃশ্যকে মানুষ হিসাবে স্বীকার করা হয় না, অস্পৃশ্যের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্ক অস্বীকৃত। অস্পৃশ্যদের উপর অমানবিক আচরণের অসংখ্য নজির আমবেদ্‌কার তাঁর বিভিন্ন রচনায় তুলে ধরেছেন। উচ্চবর্ণের ডাক্তার অস্পৃশ্যতার অভিযোগে রোগীর চিকিৎসা করেননি। অস্পৃশ্যতার কারণে বালককে ধর্মশালায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অস্পৃশ্যতার কারণে দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাকে সাহায্য করা যায়নি। অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের মানুষের খাদ্যাখাদ্যের উপর হিন্দু সমাজ নিয়ম-নিষেধ আরোপ করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক-আশাক পরিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

মানবাধিকারের জন্য আন্দোলন ॥ আমবেদ্‌কার বিশ্বাস করতেন যে, জাতভেদ প্রথার বিনাশ সাধন ব্যতিরেকে অস্পৃশ্যতার অভিশাপের অবসান অসম্ভব। তাঁর মতানুসারে একই সামাজিক ব্যবস্থার অভিন্ন নীতির উপর জাতভেদ ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত। জাতভেদ প্রথা আছে বলেই অস্পৃশ্যতা আছে। এই কারণে আমবেদ্‌কার উচ্চ-নিচ জাতিভেদ ব্যবস্থার অবসানের ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকারের উপর তিনি জোর দেন। দলিত জনসম্প্রদায়সমূহের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগঠনের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীগুলির পানীয় জলের অধিকার এবং মন্দিরে পূজার্চনার অধিকার আদায়ের জন্য আমবেদ্‌কার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সামিল হন। এ ক্ষেত্রে 'কলা রাম মন্দির সত্যাগ্রহ', 'মহা ট্যাঙ্ক সত্যাগ্রহ', 'মনুস্মৃতি পোড়ান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রের সত্যশোধক আন্দোলনের নেতৃবর্গ এ বিষয়ে আমবেদ্‌কারের উদ্যোগ-আয়োজনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন। মানবাধিকারের জন্য আমবেদ্‌কারের এই আন্দোলন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে। জাতভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতামুক্ত হিন্দু সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে আমবেদ্‌কারের উদ্যোগ-আন্দোলন বিনা বাধায় পরিচালিত হতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে বর্ণ হিন্দুরা প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা ॥ আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে হিন্দু ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে অসাম্য-বৈষম্য বর্তমান। অসাম্য-বৈষম্যের এই নীতির মধ্যে আবার তারতম্য আছে। দলিত বা অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ আবার সমগোত্রীয় নয়। তাদের মধ্যে ঐক্য বা সংহতি নেই। স্বভাবতই তারা হিন্দু সামাজিক সংগঠনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে প্রতিবাদী আন্দোলনের সামিল হতে পারে না। ন্যায়সঙ্গত সামাজিক সংগঠনের স্বার্থে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সঙ্গে বা বৈশ্য শূদ্রের সঙ্গে একযোগে সংগ্রামের সামিল হতে সম্মত হয় না। আদর্শ সামাজিক সংগঠনের স্বার্থে আমবেদ্‌কার স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এবং এই কারণে তিনি হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা সামাজিক সংগঠনের সর্বাধিক ক্ষতিকর বিষয়। চতুর্বর্ণ সমাজব্যবস্থাকে দুর্বল করে, পঙ্গু করে এবং মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমবেদ্‌কারের সুস্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল। গান্ধীজি অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেননি। সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবে চতুর্বর্ণকে মহাত্মা গান্ধী সমর্থন করেছেন। চতুর্বর্ণের পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের ইতিহাসের দিকে তিনি তাকাননি। চতুর্বর্ণের সামাজিক জীবনধারায় পারস্পরিক সদ্ভাব-সম্প্রীতি বা সহযোগিতার সম্পর্ক কখনই ছিল না। সামাজিক ক্ষেত্রে চতুর্বর্ণের মধ্যে অসদ্ভাব ও অসহযোগিতা অব্যাহত ছিল। ড. ভর্মা এ বিষয়ে বলেছেন: "According to Ambedkar, the Hindu scheme of social structure based on the four Varnas or Chaturvarna breeds inequality and has been the parent of the caste system and untouchability which are merely forms of inequality."

চতুর্থ বর্ণ হিসাবে শূদ্রদের সৃষ্টি ॥ আমবেদ্‌কার চতুর্থ বর্ণ হিসাবে শূদ্র বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতানুসারে আদিতে প্রথম তিনটি বর্ণ ছিল। চতুর্থ বর্ণ হিসাবে শূদ্ররা ছিল না। এ বিষয়ে আমবেদ্‌কার হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ এবং হিন্দু সমাজব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন গভীরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

তাঁর মতানুসারে নিজেদের কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে জাতভেদ প্রথাকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্রাহ্মণরা যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছে। আদিতে হিন্দু সমাজ কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণরা হিন্দু সমাজের এই শ্রেণীবিন্যাসকে বিকৃতির এক নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। আমবেদ্‌কার বলেছেন যে, ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি বর্ণের কথা বলা হয়েছে। এই তিনটি বর্ণ হল— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। ঋগ্বেদে শূদ্রবর্ণের কোন উল্লেখ নেই। 'সতপথ ব্রাহ্মণ'-এও স্বতন্ত্র একটি বর্ণ হিসাবে শূদ্রবর্ণের কথা বলা হয়নি। ব্রহ্ম পুরাণে শূদ্রদের একটি আদিবাসী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আদিবাসী গোষ্ঠীটি বিন্ধ্যাঞ্চলের উপরে বসবাস করত। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানে শূদ্র নৃপতিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অর্থাৎ শূদ্রদের একাধিক নৃপতি ছিলেন। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুসারে শূদ্ররা হল আর্য জনসম্প্রদায়সমূহেরই একটি অংশ। ভারতীয় আর্য সমাজে শূদ্ররা ক্ষত্রিয়দেরই একটি অংশ ছিল। শূদ্রদের বেদ পাঠের অধিকার ছিল। শূদ্রদের এই অধিকারের কথা প্রমাণ করার জন্য আমবেদ্‌কার ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি উপাখ্যান উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী শূদ্র নৃপতিদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিরোধ সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই বিবাদ-বিসংবাদের সময় ব্রাহ্মণদের উপর স্বৈরাচারমূলক আচরণ করা হয়েছে এবং বিবিধ অমর্যাদাকার আচরণ আরোপ করা হয়েছে। এই সময় শূদ্ররা ছিল আসলে ক্ষত্রিয়। এই ঘটনার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শূদ্রদের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপনয়ন সংস্কারে অস্বীকৃতি জানায়। শূদ্ররা যারা ছিল আসলে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণরা তাদের উপনয়ন করতে অস্বীকার করায়, সামাজিকভাবে তাদের অধোগতি ঘটল। তাদের স্থান হল বৈশ্যদের নীচে। এইভাবে শূদ্ররা চতুর্থ বর্ণ হিসাবে বিবেচিত হল। আমবেদ্‌কার তাঁর *Who were Shudras* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে বর্ণভেদ ব্যবস্থা এবং শূদ্রকে নিম্নতম বর্ণের মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে পরবর্তীকালে। সমাজে শূদ্ররা ক্ষত্রিয়-মর্যাদার অধিকারী ছিল। আমবেদ্‌কার এ ক্ষেত্রে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ম্যাক্স মুলার, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

শূদ্রদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্নকরণ ॥ এই সময় 'শূদ্র' শব্দটি প্রথমে একটি হীন জনগোষ্ঠী অর্থে ব্যবহার করা শুরু হয়। শূদ্র বলতে তাদেরই বোঝানো হত যাদের কোন সভ্যতা-সংস্কৃতি নেই এবং মান-মর্যাদার বালাই নেই। অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর মানুষদের বোঝানোর জন্য শূদ্র শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। তারপর কালক্রমে ব্রাহ্মণদের বিধি-ব্যবস্থা সূত্রে সহজ-সরল প্রকৃতির আরও অনেক মানুষকে শূদ্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমবেদ্‌কার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন— আর্য সমাজব্যবস্থায় সামাজিকীকরণের স্বার্থে বিবিধ সংস্কার কর্মের কথা বলা হয়। এই সমস্ত সংস্কারকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাতকর্ম, নামকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি। কেবল ব্রাহ্মণরাই এই সমস্ত সংস্কারকর্ম সম্পাদন করতে পারে। সকল আর্য ও অনার্য জনসম্প্রদায়ের জন্য এই সমস্ত সংস্কার কর্মের বিধান ব্রাহ্মণরা দিয়েছে। কিন্তু শূদ্রদের প্রতি ব্রাহ্মণদের ঘৃণার মনোভাব ছিল। তাই শূদ্রদের জন্য ব্রাহ্মণরা এই সমস্ত বিধান দেয়নি। শূদ্রদের জন্য এই সমস্ত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে ব্রাহ্মণরা অস্বীকার করে। কোন ব্রাহ্মণ এই সব সংস্কারকর্ম কোন শূদ্র পরিবারে সম্পাদন করলে তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। যাবতীয় সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার এই সমস্ত সংস্কারকর্ম সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বভাবতই সমাজে শূদ্রদের ক্ষেত্রে সকল অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। হিন্দু সমাজের অপর তিনবর্ণ শূদ্রদের হীনবর্ণ হিসাবে গণ্য করতে শুরু করে। এইভাবে শূদ্রদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। সুস্থ সমাজজীবনের স্বার্থে শূদ্রদের কাজকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। মেথরের কাজ, ঝাড়ুদারের কাজ প্রভৃতি কাজকর্মকে সমর্থন করা হয়। অথচ এই সমস্ত কাজ যারা করে তাদের ঘৃণা করা হয়। আমবেদ্‌কার হিন্দু সমাজের এই মানসিকতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ড. ভর্মা এ বিষয়ে বলেছেন: "Ambedkar has forcefully put forward the view that the Shudras were not dark-skinned aboriginals enslaved or subordinated by the Aryan invaders but they too were Aryans who belonged to the Kshatriya solar dynasty..... The Brahmins were responsible for the degradation of the Shudras. The technique to bring this about was denying the *yajnopavita* to them."

সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ॥ আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী হিন্দু সমাজের অবক্ষয়ের মূল কারণ হল প্রবল জাতভেদ প্রথা। ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধিক বিচারে সব সময় উন্নত নয়। অথচ তারা সমগ্র সমাজব্যবস্থার উপর আধিপত্য করে আসছে। এই ব্রাহ্মণ্যবাদ বা হিন্দু সমাজের গোঁড়ামী ও আধিপত্যবাদ হিন্দু সমাজে অনৈক্যের সৃষ্টি করেছে এবং অবক্ষয়ের পথ সুগম করেছে। চতুর্বর্ণের বাইরে আছে এক বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠী। এদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে। এই অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের জন্য মানবিক অধিকারসমূহ

আদায়ের দায়িত্ব আমবেদ্‌কার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। জীবন-ধারণের পরিবেশ-পরিমণ্ডলের উপর ব্যক্তি-মানুষের জীবনের সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ নির্ভরশীল। এবং তদনুসারে ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। অচ্ছুৎ জনগোষ্ঠীকে এক প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়। তার ফলে তাদের জীবনের সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুস্থ মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পৌর অধিকারসমূহ থেকে তারা বঞ্চিত হয়; দলিত জীবনযাপনে তারা বাধ্য হয়। এই অস্পৃশ্য জনসম্প্রদায়ের সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য পৌর অধিকারসমূহ আদায় করা আবশ্যক, অন্য সকল জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে এদেরও সমানাধিকারসম্পন্ন করা দরকার। আর এ সবের জন্য আবশ্যক হল হিন্দু সমাজব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার সাধন বা বৈপ্লবিক রূপান্তর। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমবেদ্‌কার শক্তিশালী সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সংগঠনের ব্যাপারে যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছেন। সত্যিকারের মানবতার জাগরণের জন্য তিনি সতত সক্রিয় ছিলেন। জাত-পাতের বিচারে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। সমাজের অবহেলিত ও অনগ্রসর জনসম্প্রদায়ের মুক্তির আন্দোলনে আমবেদকার ছিলো আন্তরিক। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বাণী এ ক্ষেত্রে তাকে পথ দেখিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের মানবিকতা ও প্রগতির ধারণা তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

পিছড়ে বর্গের স্বার্থ সংরক্ষণ ॥ ১৯৩০ সালে বোম্বাই (মুম্বাই) সরকার একটি রাজ্য কমিটি গঠন করে। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল দলিত শ্রেণীসমূহের শিক্ষাগত, সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা অনুধাবন। আমবেদ্‌কারকে এই কমিটির সদস্য করা হয়। আমবেদ্‌কার এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে সুপারিশ করেন। এই সমস্ত সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: দলিত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা; সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা; সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তাদের ব্যাপকভাবে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা প্রভৃতি। আমবেদ্‌কার সর্বভারতীয় দলিত শ্রেণীসমূহের সংস্থার সভাপতি ছিলেন। এই পদাধিকার সূত্রে তিনি ১৯৩০ সালে অনগ্রসর ও অস্পৃশ্য শ্রেণীসমূহের কিছু দাবি-দাওয়ার সাংবিধানিক স্বীকৃতির ব্যাপারে উদ্যোগী হন। তিনি দাবি জানান যে বিভিন্ন সরকারি কমিটিতে এই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য কথাটির পরিবর্তে হরিজন শব্দটি ব্যবহারের কথা বলেন। গান্ধীজির এই উদ্যোগকে আমবেদ্‌কার সমর্থন করতে পারেননি। মহাত্মা গান্ধী হরিজন সেবক সংঘ গঠন করেন। এই সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যতার অপসারণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও গান্ধীজির উদ্যোগকে আমবেদ্‌কার সমর্থন করতে পারেননি। কারণ হরিজন সেবক সংঘের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ছিল বর্ণ হিন্দুরা। তা ছাড়া এই সংঘটি ছিল কংগ্রেস দলেরই একটি অঙ্গ। কংগ্রেসের পক্ষে দলিত শ্রেণীসমূহের সমর্থন সংগ্রহের জন্যই এই সংঘটি গঠিত হয়েছিল। এই অবস্থায় আমবেদ্‌কার 'সমতা সৈনিক দল' নামে স্বতন্ত্র একটি সংস্থা গঠন করেন।

ভাইসরয়ের প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য ॥ ভাইসরয়ের প্রশাসনিক পরিষদের সদস্য হিসাবে আমবেদ্‌কারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৪২ সালের ২ জুলাই। ভারতের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ঘটনাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। কারণ এই প্রথম অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের একজন মানুষকে সর্বোচ্চ সরকারি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হল। সমকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সরকারি পর্যায়ের এই স্বীকৃতি অভাবিত। ভাইসরয়ের প্রশাসনিক পরিষদে আমবেদ্‌কারকে শ্রমদপ্তর দেওয়া হয়। এই পদাধিকারসূত্রে শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য এবং শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য অধিকারসমূহ আদায়ের জন্য তিনি যথাসাধ্য উদ্যোগী হয়েছেন। তা ছাড়া দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারেও আমবেদ্‌কার তার এই পদটিকে কাজে লাগিয়েছেন। সর্বোপরি মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্যও তার আন্তরিক উদ্যোগ অনস্বীকার্য।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ॥ আমবেদ্‌কার ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিল উদার, মানবিকতাবাদী ও প্রগতিবাদী। তাঁর মতানুসারে ধর্ম মানুষের আচরণে নীতিবোধকে জাগরিত করে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৌভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করে। মানবাত্মার মুক্তি সাধনে ধর্মের সদর্থক ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমবেদ্‌কারের ধর্মীয় চেতনা এই পথে প্রসারিত। তিনি ধর্ম বলতে দেবত্ববাদকে বোঝেননি বা গুরুবাদকে স্বীকার করেননি। ধর্মের নামে মানবিকতাবোধের অপলাপের তিনি বিরোধিতা করেছেন। হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছেন এবং আধিপত্যবাদকে অস্বীকার করেছেন। আমবেদ্‌কারের ধর্মবিশ্বাসের উপাদানসমূহের উপস্থিতি বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। এক সময় তিনি বলেছেন যে তিনি জন্মেছেন অস্পৃশ্য হিন্দু হিসাবে। এটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু হিন্দু হিসাবে মরতে তিনি অপারাগ। স্বভাবতই তিনি হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

প্রণীত গ্রন্থাবলী ॥ আম্বেদ্‌কার কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

1. The Untouchables, Who are they ?
2. Who were the Shudra ?
3. States and Minorities.
4. Emancipation of the Untouchables.
5. Annihilation of Caste.

৯.৩ ধারণা, পদ্ধতি এবং মতাদর্শ (Concepts, Methodology and Ideology)

ভালেরিয়ান রডরিগস (Valerian Rodcrigues) তাঁর *The Essential Writings of B. R. Ambedkar* শীর্ষক গ্রন্থে আম্বেদ্‌কার-এর রচনাবলীর পরিধি ও গভীরতা, বৌদ্ধিক মর্মভেদিতা এবং সামাজিক ও রাজনীতিক বিষয়াদির বাস্তববাদী মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আম্বেদ্‌কারের রচনা সম্যকভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে রডরিগস্‌-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

ধারণাগত বিভিন্নতা ॥ বহু ও বিভিন্ন ধারণার উপর আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা আম্বেদ্‌কারের রচনাসমূহের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিটি ধারণাকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং সম্যকভাবে অনুসন্ধানও বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন; তাদের বিভিন্ন নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন এবং মলিনতা ও আবর্জনাকে অপসারিত করে ধারণাকে স্বচ্ছ করেছেন। ধারণাসমূহকে তুলে ধরার জন্য তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। অনেক সময় ঐতিহাসিক বিকাশের আলোকে; আবার ক্ষেত্রবিশেষে বিবাদ-বিসংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ধারণাগত বিষয়াদিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। অনেকক্ষেত্রে ব্যাপক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তিনি জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত ধারণা অভিক্ষিপ্ত করেছেন। আবার ক্ষেত্রবিশেষে তিনি কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের মতবাদগত অবস্থান থেকে কোন একটি ধারণা নিয়েছেন এবং নতুন কিছু বক্তব্য সুপারিশ বা আরোপ করেছেন।

কিছু কিছু ধারণাকে তিনি বৈপ্লবিকভাবে উল্টে-পাল্টে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে 'কম্ম' সম্পর্কিত ধারণাটির কথা বলা যায়। আম্বেদ্‌কার তার *The Buddha and His Dhamma* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পালী ভাষায় 'কম্ম' শব্দের অর্থ 'কর্ম'। কর্ম বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয়। আম্বেদ্‌কারের যুক্তি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ্য নীতি মোতাবেক 'জন্ম' ও 'পুনর্জন্ম' হল কর্মের ফলানুসারী। এই ধারণা জাতব্যবস্থাকে তুলে ধরে ও শক্তিশালী করে। আবার এই ধারণা মানুষের স্বাধীনতার সীমানাকে ধ্বংস করে এবং আত্মার স্থায়িত্ব ও শাশ্বত প্রকৃতিকে সমর্থন করে। অপরদিকে 'কম্ম' সম্পর্কিত বুদ্ধের ধারণা বিপরীত। তদনুসারে কম্মের ধারণা বিদ্যমান জীবের অবসান এবং জীবনের নতুন রূপে তাদের পুনর্গঠনের কথা বলা হয়।

অনেক সময় আম্বেদ্‌কার সদৃশ ধারণার সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে একটি ধারণার সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করেছেন। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ধর্মের সঙ্গে 'ধম্ম', 'স্বধম্ম'-এর তুলনামূলক আলোচনার কথা বলা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন ধরনের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি অধিকতর সাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন সেই সমস্ত ধারণার আলোচনায়, যেগুলি কম দুর্বোধ্য ও অভিজ্ঞতার নিকটবর্তী; বাস্তবে ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকর। এইভাবে আম্বেদ্‌কার ভারতে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন এবং স্বাস্থ্যকর বিতর্কের বনিয়াদ গড়ে তুলেছেন।

পদ্ধতিগত বিভিন্নতা ॥ আম্বেদ্‌কার বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে বিভিন্নভাবে অনুশীলন-অন্বেষণ করেছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপকভাবে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া-প্রণালী প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩৭ ও ১৯৪৫ সালের নির্বাচনী সমীক্ষার কথা বলা যায়। তফসিলি জাতিসমূহের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রের উপর এই সমীক্ষা সম্পাদিত হয়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সরেজমিন সমীক্ষা সম্পাদন করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ অনেক সমীক্ষায় তিনি দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে নীতি ও বিচার্য বিষয়ের বড়সড় পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। এই সমস্ত সমীক্ষা-কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান ও তথ্যাদির জন্য বহু ও বিভিন্ন নথিপত্র ও লেখ্যাগারের সাহায্য নিয়েছেন। লেখ্যাগারের পরিসংখ্যান, সরকারি নথিপত্র, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি ও প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর তিনি সরাসরি নির্ভর করেছেন।

তাঁর *Who are the Shudras* শীর্ষক রচনাটি ব্যাখ্যামূলক প্রকৃতির। এখানে প্রাপ্ত প্রামাণ্য পুস্তকসমূহের সাহায্য তিনি নিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প মতামত প্রস্তাব করেছেন। কারণ সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য পুস্তকসমূহে প্রাপ্ত ব্যাখ্যাসমূহ কিছু জানা বিস্তারিত বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানে সমর্থ নয়।

The Untouchables শীর্ষক গ্রন্থটির রচনাকর্মে একটি সুস্পষ্ট থিসিস গঠনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এই থিসিসটির বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয় হল যে, নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠী যার অস্তিত্ব কেবল ঐ গোষ্ঠীর মধ্যেই বর্তমান এবং সকলেই তার অংশীদার। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং উপযুক্ত মানদণ্ডের উপরও আম্বেদকার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী জনপ্রিয় বিশ্বাস এবং জোরদার মূল্যায়নকে উপেক্ষা করে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তা আলোচ্য বিষয়কে বস্তুগত দিক থেকে ধরতে ছুঁতে পারে না। আম্বেদকারের অভিমত অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধীর হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের স্বীকৃত মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মতাদর্শমূলক পরিচয় ॥ আম্বেদকার নিজেই নিজেকে 'প্রগতিশীল র‍্যাডিক্যাল' (progressive radical) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আবার ক্ষেত্রবিশেষে তিনি নিজেকে 'প্রগতিশীল রক্ষণশীল' "(progressive conservative)" হিসাবেও পরিচিত করেছেন। অর্থাৎ প্রগতিশীল হিসাবে নিজের মতাদর্শগত পরিচয়ের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। নির্দিষ্ট বিষয়ের বিচার বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উদারনীতিক এবং কমিউনিস্টদের থেকে পৃথক করে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মতাদর্শ ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে ইংরেজ আদর্শবাদী, ফ্যাবিয়ান গোষ্ঠী, সেলিগম্যান (Saligman), জন ডিউই (John Dewey), আর. এ. এডউইন (R. A. Edwin)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মতাদর্শগত বিচারে, এঁদের দিক থেকে আম্বেদকার গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আম্বেদকার বিবিধ যুক্তি দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল যে, জাতপাতের ধারণা এবং অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা হিন্দুদের একটি সুসংবদ্ধ জনসম্প্রদায় হিসাবে নিজেদের তুলে ধরতে ও কাজ করতে দেয়নি। হিন্দুধর্মে নৈতিক শৃঙ্খলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি সাধারণত ধর্মের কার্য-কারণমূলক অবরোহী পরিচয় প্রদান করেননি; বরং সমাজতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনার উপর জোর দিয়েছেন এবং ক্রিয়াকর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন যে সাধারণভাবে গৃহীত ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সামাজিকভাবে পৃথকীকৃত ক্ষেত্রসমূহের। আম্বেদকার হিন্দুধর্মের মধ্যে মতাদর্শমূলক অসংখ্য সংঘাত লক্ষ্য করেছেন। শৈশবাবস্থায় ভক্তিবাদী বক্তব্যের মধ্যেই আম্বেদকারকে মানুষ করা হয়েছে। কিন্তু ভক্তিবাদের প্রতি তাঁর কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ বা ভালোলাগা ছিল না। তিনি ভক্তিবাদী সন্ন্যাসীদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কারণ তাঁরা শাস্ত্রীয় ভাষ্য প্রদান করতে পারেননি। অথচ শাস্ত্রীয় ভাষ্যেই নীতিমূলক এবং পবিত্র মানদণ্ড বর্তমান।

আম্বেদকার জাত-কুল, ভাষা ও সংস্কৃতিগত দাবিদাওয়ার নামে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত পরিচিতির প্রকাশ প্রসঙ্গে অতিমাত্রায় সন্দিহান ছিলেন। কারণ এই পরিচয়ের বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর সমস্যাটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যখন পরিচয়ের প্রাধান্য কায়েম করার বিষয়টি বড় হয়ে উঠে, তখন সংখ্যালঘুদেরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা অধিক। আম্বেদকার সংখ্যাগরিষ্ঠবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয় তুলে ধরেছেন। এই বিষয়গুলি হল ঃ আইনের অনুশাসন, সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষাধিকারসমূহ এবং একটি নাগরিক সমাজের অস্তিত্ব। এই নাগরিক সমাজ সভ্য সামাজিক গুণ হিসাবে গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করবে।

আম্বেদকার রাষ্ট্রের ভূমিকার তাৎপর্যের বিষয়টিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁকে প্রভাবিত করেছে আমেরিকার 'কলম্বিয়া' বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ইংল্যান্ডে 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস'-এর শিক্ষাদীক্ষা এবং ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা। তিনি উন্নয়নমূলক বা উন্নতিবিধায়ক দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। স্বভাবতই তিনি গান্ধীবাদী ও উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপমূলক পন্থা-পদ্ধতিকে সমর্থন করেছেন। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রদানের পক্ষপাতী। আবার প্রয়োজনে হস্তক্ষেপের কারণ ও সীমার কথাও তিনি বলেছেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে আম্বেদকার আর্থনীতিক গণতন্ত্রের পরিপোষক হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকারের কথা বলেছেন এবং এ বিষয়ে ব্রিটিশ শাসনের বৃহৎ সদর্থক অবদানের কথা বলেছেন। তবে ভারতে প্রচলিত আইনের চোখে সাম্যের ধারণা প্রসঙ্গে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি অধিকতর জোরদার সাম্যের ধারণাকে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। তিনি বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে সাম্য, সম্মানের ক্ষেত্রে সাম্য এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে সাম্যের কথা বলেছেন। সম্মানের ধারণা এবং জনসম্প্রদায়ের ধারণা তাঁর বিচার-বিবেচনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। ফরাসী বিপ্লবের সৌভ্রাতৃত্বের ধারণাকে তিনি জনসম্প্রদায়ের ধারণার সমার্থক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী ভগবান বুদ্ধ সুসংবদ্ধ জনসম্প্রদায় গড়ে

তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জনসম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীনতা সম্পর্কিত আম্বেদ্‌কারের ধারণা টমাস হিল গ্রীণ (T. H. Green)-এর সংশ্লিষ্ট ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে মার্কসীয় দর্শনের ব্যাপারে আম্বেদ্‌কারের মধ্যে অতিরিক্ত আগ্রহের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর এই সময়কার বিশিষ্ট রচনা সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *Buddha and Karl Marx, Buddha and the Future of his religion* এবং *Buddha and his Dhamma*। সংশ্লিষ্ট রচনাসমূহে কার্ল মার্কসকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কতকগুলি বিষয়কে চিহ্নিত করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে কার্লমার্কস-এর সঙ্গে তাঁর মতবাদগত অবস্থানের সাদৃশ্য ছিল। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি হল: (১) দর্শনের ভূমিকা হল দুনিয়াটিকে বদলে দেওয়া; (২) শ্রেণিসমূহের মধ্যে সংঘাত বর্তমান; (৩) সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা শোষণ ও দুঃখ-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে; এবং (৪) সুস্থ সমাজের জন্য প্রয়োজন হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানার ব্যবস্থা করা। আম্বেদকারের অভিমত অনুযায়ী উল্লিখিত চারটি বিষয়েই গৌতম বুদ্ধ এবং কার্ল মার্কস-এর মধ্যে সহমত বর্তমান।

আম্বেদকার মার্কসবাদের সকল বিষয়ে সহমত পোষণ করেননি। মার্কসীয় দর্শনের বেশ কিছু বিষয়ের তিনি বিরোধিতা করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি হল: (ক) ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যা; (খ) সর্বহারার সর্বস্বান্ত হওয়া; (গ) সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা; (ঘ) সর্বহারার একনায়কত্ব; (ঙ) রাষ্ট্রের উবে যাওয়া; এবং (চ) ক্ষমতা দখলের জন্য হিংসাশ্রয়ী পথ অবলম্বন। আম্বেদকারের অভিমত অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা এবং সমাজের নৈতিক বনিয়াদের কথা বলা হয়। সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য তা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও মার্কসবাদের মধ্যে মতবিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। বি. কে. নাগলা (B. K. Nagla) তাঁর *Indian Sociological Thought* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "..... while liberal and modernist alliances of Buddhism were taking place elsewhere, Ambedkar wanted to relocate Buddhism in the trajectory of Marxism and vice versa."

৯.৪ জাত ও অস্পৃশ্যতা (Caste and Untouchability)

জাতব্যবস্থা ॥ আম্বেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী জাত ব্যবস্থা হল হিন্দুধর্মের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগত উপাদান। তবে কিছু সংস্কারক জাতব্যবস্থার বিরোধিতা করে এর অবসানের কথা বলেছেন। তবে গভীরভাবে আচরিত বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্পূর্ণ লঙ্ঘনের মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু জাতপাতের বিধি-ব্যবস্থা অমান্য করছে। তবুও জাতপাতের অস্তিত্ব অব্যাহত। জাতপাত এবং জাতব্যবস্থা সম্পর্কিত আম্বেদকারের ধ্যান-ধারণা দীর্ঘকালীন কর্মজীবনে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। গোড়ার দিকে তিনি জাতের বৈশিষ্ট্য হিসাবে সগোত্র বিবাহের কথা বলেছেন। জাত ব্যবস্থার ক্ষতিকারক ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি সতীদাহ, বাল্যবিবাহ এবং বিধবা বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, কোন একটি জাত যদি তার সীমানাকে অবরুদ্ধ করে দেয়, তাহলে অন্যান্য জাতও একই পথে হাঁটতে বাধ্য হয়। প্রথমে ব্রাহ্মণরাই সামাজিকভাবে নিজেদের অবরুদ্ধ করেছে এবং জাতব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে।

আম্বেদ্‌কার দেখেছেন যে, গান্ধীজি প্রথমে জাত ব্যবস্থাকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু পরবর্তী কালে জাতব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন এবং জাতের পরিবর্তে বর্ণ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর 'বর্ণ' সম্পর্কিত ধারণা 'জাত' সম্পর্কিত ধারণার সমার্থক। অর্থাৎ গুণগত যোগ্যতার পরিবর্তে জন্মগত পরিচয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ। তারফলে ক্রমমাত্রাগত অসাম্য এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের অস্বীকৃতির সৃষ্টি হয়। জনসম্প্রদায়মূলক বন্ধনের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

আম্বেদকার জাতের বৈশিষ্ট্য হিসাবে সগোত্রবিবাহ ব্যবস্থার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল শ্রমবিভাজন, সহভোজনে বাধা; জন্ম সম্পর্কিত রীতিনীতি। তিনি জাতভিত্তিক নামের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ এই নামই জাতব্যবস্থার নীতিমানমূলক মানদণ্ডে অসাম্য নির্ধারণ করে। ক্রমস্তরবিভক্ত এই অসাম্য জাতের সদস্যদের মধ্যে সাম্যকে পৌঁছতে দেয় না।

জাতপাতের সমাধানকল্পে আম্বেদকার জাতের মূলোৎপাটনের প্রস্তাব করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে কতকগুলি উপায়-পদ্ধতি সুপারিশ করেছেন। যেমন, অসবর্ণ বিবাহ এবং বিভিন্ন জাতের মধ্যে সহভোজন। তবে দ্বিতীয় উপায়টি স্থায়ী প্রকৃতির বন্ধন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এককভাবে অত্যন্ত দুর্বল। তিনি আরও সুপারিশ করেছেন যে, বংশানুক্রমিক পুরোহিতগিরির অবসান আবশ্যক। উপযুক্ত গুণগত যোগ্যতাযুক্ত সকল সহ-ধর্মানুরাগীদের কাছেও পুরোহিতের কাজ করার সুযোগ বা অধিকার উন্মুক্ত করা দরকার। রাষ্ট্র এ বিষয়ে সংশাপত্র প্রদান

করতে পারে। তবে আম্‌বেদ্‌কার এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন যে, হিন্দুরা সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ স্বীকার বা সমর্থন করবে না। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে গোড়ার দিক পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কারের যাবতীয় আশা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু 'হিন্দু কোড বিল' (Hindu Code Bill)-এর ব্যাপারে তাঁর আশা-ভরসা ছিল।

অস্পৃশ্যতা ॥ আমবেদ্‌কার অস্পৃশ্যতা ও জাত ব্যবস্থা এই দুটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর মতানুসারে জাতপাতের দ্বারা অস্পৃশ্যতা শক্তিশালী হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা উভয়েরই শত্রু। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বাইরের লোকের পক্ষে অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবিহিত হওয়া সম্ভব নয়। অস্পৃশ্যদের অমানবিক অবস্থার অপনোদনের জন্য মানবিক সহানুভূতি আসবে অনেক। কিন্তু তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, এ ক্ষেত্রে বহু ও বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে। প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে তিনি কিছু উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল: সুদীর্ঘকালের সংস্কারসমূহ; বিভিন্ন স্বার্থ; ধর্মীয় পুনর্বণ্টন; সামাজিক পিরামিডের বোঝা; এবং অস্পৃশ্যদের আর্থিক দৈন্যদশা।

আম্‌বেদ্‌কার-এর অভিমত অনুযায়ী অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীসমূহের দুর্দশার নিরসনের লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক সরকার উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম তাদের অন্তর্নিহিত ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী অস্পৃশ্যতায় ইন্ধন যোগায়নি; একথা ঠিক। কিন্তু অস্পৃশ্যতার মোকাবিলায় এই দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভূমিকার ইতিহাস সন্তোষজনক নয়।

অস্পৃশ্যতার সঙ্গে গবেষক ও বৌদ্ধিক ক্রিয়াকারী হিসাবে আম্‌বেদকারের সংযোগ-সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এ বিষয়ে দুঃখ এবং ক্রোধ সমন্বিতভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। বিস্ময়-ক্রোধ ও বেদনাহতভাবে তারস্বরে প্রশ্ন করেছেন কী করে এতদিন ধরে এ রকম একটি অমানবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সহ্য করা হয়েছে, এমন কি সমর্থনও করা হয়েছে। অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্যদের সদিচ্ছা সম্পর্কেও তিনি গভীর সন্দেহ-সংশয় অপ্রকাশিত রাখেননি।

ভারতে অস্পৃশ্যদের স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে স্বীকৃতির ব্যাপারে আম্‌বেদকার সংগ্রাম করেছেন। স্বভাবতই তিনি তাদের সাংবিধানিকভাবে উপযুক্ত রক্ষাকবচ নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছেন। ঔপনিবেশিক শাসন এবং গান্ধীবাদী নেতৃত্ব কেবল মুসলমান ও শিখদের স্বতন্ত্র জনসম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন দেখিয়েছেন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসের ধারায় অস্পৃশ্যতার উৎপত্তির বিষয়টি নিয়ে আম্‌বেদ্‌কার বিশেষ মাথা ঘামাননি। বংশ-কুলের সঙ্গে অস্পৃশ্যতার সংযোগ-সম্পর্কের যুক্তিটিকে তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। জাতের ভিত্তি হিসাবেও বংশ-কুলের বিষয়টিকে তিনি স্বীকার করেননি। তবে একটি ক্ষেত্রে তিনি কাল্পনিক বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী অস্পৃশ্যরা হল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবর্গ। গ্রামের সীমানায় বা প্রান্তিক অঞ্চলে তাদের বসবাস। বৌদ্ধধর্ম এবং গোমাংস ভক্ষণ ছাড়তে তারা রাজী হয়নি। এই কারণে তাদের নিন্দিত অস্পৃশ্য অবস্থান প্রদান করা হয়েছে। তবে পরবর্তী কালে কখনই তিনি প্রামাণ্য মত হিসাবে এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেননি।

আম্‌বেদ্‌কার-এর অভিমত অনুযায়ী কিছু পার্থক্য ও সংঘাতের বিষয় থাকলেও সাধারণভাবে সকল অস্পৃশ্যই বর্ণহিন্দুদের কাছ থেকে একই রকমের অসুবিধাজনক আচরণ ও দুর্ভোগের শিকার হয়। গ্রামের কিনারায় 'ঘেটো'তে তাদের বসবাস করতে হয়। সামগ্রিকভাবে তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হয়। বিবিধ প্রকারের অসামর্থ্য তাদের উপর আরোপ করা হয়। আম্‌বেদকার রেখাচিত্রের সাহায্যে অস্পৃশ্যদের আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে অর্থবহ পরিচয় প্রদান করেছেন। তবে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সংঘটিত সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের আলোচনাটি অধিকতর সুনির্দিষ্ট।

অস্পৃশ্যতার অপসারণের ব্যাপারে গান্ধীজির উদ্যোগ-আয়োজনকে আম্‌বেদ্‌কার নিদারুণ অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী এ বিষয়ে গান্ধীজির পদক্ষেপ বিভ্রান্তিমূলক। তাঁর সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ-আয়োজনের উদ্দেশ্য হল দয়া দেখিয়ে অস্পৃশ্য মন পাওয়া। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পরিসংখ্যান ব্যাপকভাবে প্রদান করেছেন। গান্ধীজির চালে পা না দেওয়ার জন্য তিনি অস্পৃশ্যদের সাবধান করে দিয়েছেন।

অস্পৃশ্যতার মোকাবিলার ব্যাপারে আম্‌বেদকার তাঁর নিজস্ব কৌশল ও পরিকল্পনা সুপারিশ করেছেন। রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর সামিল হওয়ার জন্য তিনি অস্পৃশ্যদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ও প্রণোদিত করেছেন। অন্য কিছু শক্তি নিজেদের রাজনীতিক চৌহদ্দির মধ্যে অস্পৃশ্যদের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে কৌশলপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছে। আম্‌বেদকার সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব বা সুপারিশকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। খ্রিস্টান বা মুসলমান হয়ে সংশ্লিষ্ট অস্পৃশ্যরা ভাল আছে, এমন কথাকে আম্‌বেদ্‌কার আমল দেননি। কিন্তু খ্রিস্টান বা

মুসলমানরা ধর্মীয় মতবাদ হিসাবে অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করে না। এই বিষয়টি অস্পৃশ্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। স্বভাবতই আমবেদ্‌কার এই বিষয়টিকে অন্য চোখে দেখেছেন।

আম্‌বেদ্‌কার বিশ্বাস করতেন যে অস্পৃশ্যদের লড়াই লড়তে হবে নিজেদেরই। অন্যেরা তাদের বিষয়ে আগ্রহ-আন্তরিকতা দেখালে, এই লড়াই-এ সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হবে; কেবল সমাধান সুপারিশ করলেই হবে না। অস্পৃশ্যদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার এবং তাদের আনুপাতিক জনসংখ্যাকে কম করে দেখানোর উদ্যোগকে নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, এ জাতীয় উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল তাঁদের পর্যাপ্ত রাজনীতিক উপস্থিতিকে অস্বীকার করা। আম্‌বেদ্‌কার এ ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনার সাহায্য নিয়েছেন এবং তুলনীয় জনগোষ্ঠী হিসাবে দাস এবং ইহুদীদের কথা বলেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী অস্পৃশ্যদের অবস্থা এদের থেকেও খারাপ।

৯.৫ আমবেদ্‌কারের ধর্মীয় চিন্তা (Religious Thought)

আম্‌বেদ্‌কারের রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ধর্ম সম্পর্কিত মতামতপূর্ণ। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সরাসরি তিনি অনেক কথাই বলেছেন। তবে সংশ্লিষ্ট অনেক বক্তব্যই প্রকাশিত হয়নি। হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত বেশ কিছু বক্তব্য প্রাথমিক পাণ্ডুলিপির পর্যায়ে থেকে গেছে। প্রধানত বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে তিনি ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আম্‌বেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী নৈতিকতা ও যুক্তির ভিত্তিতে সমাজকে গড়ে তোলার উদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছে। আর্য সমাজের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক ও মতাদর্শ ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম হল একটি বৃহৎ বিপ্লব। বৌদ্ধধর্ম বর্ণব্যবস্থার নিন্দা ও বিরোধিতা করেছে। দরিদ্র ও শোষিত মানুষ এবং মহিলাদের জন্য এই প্রতিবাদী ধর্ম আশার বাণী শুনিয়েছে। কুসংস্কার, পশুবলি ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে এই ধর্ম জেহাদ ঘোষণা করেছে। আমজনতাকে ক্ষমতান্বিত ও সক্রিয় করাব জন্য বৌদ্ধসংঘ আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। আবার ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে এই প্রতিবাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় সামিল হয়েছে।

আম্‌বেদ্‌কার বৌদ্ধধর্মের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভাষ্যকাররা একে 'আম্‌বেদ্‌কারের বৌদ্ধধর্ম' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আম্‌বেদ্‌কার অন্যান্য ধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেছেন। বিশেষত তিনি ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের থেকে বৌদ্ধধর্মের অধিকতর উন্নত অবস্থানের কথা বলেছেন। তিনি হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মকে বিকশিত করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যদি হিন্দুধর্মের ছিটেফোঁটাও থাকে, তা হলে ধরে নিতে হবে যে, তা হল ব্রাহ্মণ্য প্রক্ষেপ। আম্‌বেদকার বৌদ্ধধর্মকে একটি মতাদর্শ হিসাবে দেখেছেন। এই মতাদর্শ বিশ্বসংসার সম্পর্কিত। এখানে দীন-দরিদ্র ও শোষিত মানুষের বিশেষাধিকারের কথা বলা হয়েছে। আম্‌বেদ্‌কার বার বার বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্মের একটি সামাজিক বার্তা আছে।

'The Buddha and his Dhamma' আম্‌বেদ্‌কারের একটি প্রধান রচনা হিসাবে পরিগণিত হয়। আম্‌বেদ্‌কার জীবনভোর যে সব বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছেন, সে সবের পরিচয় এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। বিরোধীদের থেকে তাঁর মতামতের পার্থক্য এই পুস্তকটিতে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটিতে ভগবান বুদ্ধের মূল বাণীসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের বাণীর উপর প্রাসঙ্গিক মতামতও সংকলিত হয়েছে। মানবসভ্যতার সাম্প্রতিক সমস্যাদির সমাধানের সূত্র সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক বার্তা বৌদ্ধের বাণীর উপর সংকলিত ভাষ্যে পাওয়া যায়।

আম্‌বেদ্‌কার সামাজিক রূপান্তরের যে আবক্রপথের পরিচয় দিয়েছেন তা কতকগুলি পর্যায়ে বিভক্ত। এই পর্যায়গুলি হল: বৈদিক সমাজ এবং আর্যসমাজে তার অবক্ষয়; বৌদ্ধধর্মের উত্থান এবং বৌদ্ধধর্ম কর্তৃক সামাজিক ও নৈতিক রূপান্তরের গতিধারার সূত্রপাত; এবং চূড়ান্তভাবে প্রতিবিপ্লব ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থান। আম্‌বেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী প্রতিবিপ্লবকে প্রবর্তিত করেছে এবং বৈধতা প্রদান করেছে সাধারণভাবে স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ এবং বিশেষভাবে মনুস্মৃতি। মনুস্মৃতির মাধ্যমে মানুষজনের জন্য সামাজিক ভূমিকা নির্ধারণ বা নির্দিষ্টকরণের ব্যবস্থা হয়েছে; শূদ্রদের ক্রীতদাসত্বে অবনমিত করা হয়েছে; এবং মহিলাদের কলঙ্কজনক অবস্থায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপরীতক্রমে বৈদিক সমাজে সামাজিক ভূমিকা নির্দিষ্টকরণের নির্ধারক নীতি ছিল বর্ণ। বর্ণভিত্তিক সামাজিক ভূমিকা নির্দিষ্টকরণের এই নীতি ছিল নিসন্দেহে সন্তোষজনক। এই বর্ণভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজ ছিল ক্রমোচ্চভাবে স্তরবিন্যস্ত। তবে সামাজিক সচলতার সুযোগ ছিল ব্যাপক।

আম্‌বেদকারের অভিযোগ অনুযায়ী হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহের অর্থ ও নির্দেশ সম্যকভাবে অনুধাবনের ব্যাপারে কোন সুমন্বিত ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা নাই। সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহের নিজেদের মধ্যে বিবাদ আছে এবং প্রবণতা ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধেও বিবাদ আছে। বেদসমূহের মধ্যে সংঘাত আছে। বৈদিক চিন্তার সঙ্গে ঔপনিষদিক চিন্তার

বিরোধ আছে। শ্রুতিশাস্ত্র বিরোধী যুক্তি স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের মধ্যে বর্তমান। অনেক সময় বেদসমূহকে স্মৃতি-শ্রুতি শাস্ত্রসমূহের থেকে অধস্তন অবস্থান প্রদান করা হয়। দেবতাদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে খাড়া করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রসমূহের তুলনা করা হয়। আম্‌বেদ্‌কারের আরও বক্তব্য হল যে, হিন্দুধর্মের রাম ও কৃষ্ণ এই দুই সর্বজন আরাধ্য শ্রেষ্ঠ অবতার পুরুষ সম্পর্কে প্রশংসা করার খুব বেশী কিছু নেই। তাঁদের সম্পর্কে নৈতিকভাবে উন্নতি সাধনমূলক তেমন কিছু নেই। তাছাড়া হিন্দুধর্মের মুখ্য শাস্ত্রসমূহের সময়-কাল সম্পর্কে অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিতরা যা বলেন, আম্‌বেদ্‌কার তার থেকে পরবর্তী সময়-কালের কথা বলেন।

আম্‌বেদ্‌কার উপনিষদের উপর বিশেষ কোন মন্তব্য করেননি। বাকি সব হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহের তুলনায় উপনিষদসমূহের প্রতি তিনি কিছুটা প্রসন্ন প্রতীয়মান হন। ১৯৩৬ সালের দিকে আম্‌বেদ্‌কারের বোধ হয় যে, ঔপনিষদিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মকে পরিশীলিত বা পুনর্লিখিত আকারে পাওয়া সম্ভব নয়।

আম্‌বেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা হল একটি বৌদ্ধোত্তর ধর্মগ্রন্থ। মূলত কর্মকাণ্ডের সমর্থনমূলক একটি ভাষ্য গীতাশাস্ত্রের সুবাদে পাওয়া যায়। কর্মকাণ্ড বলতে ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম ও আচারানুষ্ঠান; তবে ইতিমধ্যে সংযুক্ত অতিবর্ধিত বিষয়াদি বাদ দিয়ে। আম্‌বেদ্‌কারের বিশ্বাস অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিপাকে পড়ে যায়। কেবল বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও আচারানুষ্ঠানমূলক যুক্তিতর্কের বা আবেদনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে যুক্তিগ্রাহ্য হিসাবে প্রতিপন্ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ রকম পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থনে গীতাশাস্ত্র বেশকিছু দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করে। তাঁর মতানুসারে বদরায়নের ব্রহ্মসূত্রের বিরুদ্ধে জৈমিনির মীমাংসার অবস্থানকে সমর্থন করা হয়েছে।

৯.৬ আম্‌বেদ্‌কারের আর্থনীতিক চিন্তা (Economic Thought of Ambedkar)

আম্‌বেদ্‌কার সুদীর্ঘকাল ধরে মাঝেমধ্যেই আর্থনীতিক বিষয়াদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং মতামত প্রকাশ করেছেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি একটি দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। প্রবন্ধটির নাম 'Ancient Indian Commerce'। কিন্তু প্রবন্ধটি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করেননি। এই রচনাটিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, তার নিজের অর্থনীতির প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বালোচনাটিতে তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিষয় তিনটির নাম হল। (i) 'Commercial Relations of India with the Middle East', (ii) 'Commercial Relations of India in the Middle Ages' এবং (iii) 'India on the Eve of the Crown Government'.

আর্থনীতি বিষয় নিয়ে আম্‌বেদ্‌কারের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'The Administration and Finance of East India Company'। এই রচনায় কোম্পানী-শাসনের শোষণমূলক প্রকৃতি তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। ১৮৫৭ সাল অবধি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংগঠন; রাজস্বের উৎসসমূহ; এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে আম্‌বেদ্‌কার অর্থবহ আলোচনা করেছেন।

আম্‌বেদ্‌কারের আর একটি বিশিষ্ট আর্থনীতিক রচনা হল 'The Evolution of Provincial Finance in British India'। আম্‌বেদ্‌কারের এই রচনাটি রাণাডে (Ranade)-র একটি রচনার সঙ্গে সম্পর্কিত। রাণাডের রচনাটির আলোচনার বিষয় হল ১৮৩৩ সাল থেকে ১৯১৯ সাল অবধি ব্রিটিশ শাসিত ভারতে কেন্দ্র এবং প্রদেশসমূহের পরিস্থিতি। আম্‌বেদ্‌কার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে বিবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন। সাম্প্রতিককালে আলোচিত সংশ্লিষ্ট যুক্তিসমূহের সঙ্গে আম্‌বেদকারের যুক্তিগুলির উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আম্‌বেদ্‌কারও আর্থনীতিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। তাঁর যুক্তি হল ক্ষমতা ও দায়িত্ব সেই স্তরেই থাকা উচিত যে স্তরে সর্বাধিক সদ্ব্যবহার সম্ভব। এই নীতির ভিত্তিতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব বণ্টিত হলে রাজ্যগুলি শক্তিশালী ও আর্থনীতিকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন হবে। কেন্দ্র কার্যকরভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করতে পারে না, এমন সব ক্ষমতা ও দায়িত্ব রাজ্যের হাতে চলে যাবে। তারফলে কেন্দ্রও অধিকতর শক্তিশালী ও সফল হবে।

আম্‌বেদকার তাঁর Ph. D. ডিগ্রীর জন্য গবেষণামূলক রচনা 'London School of Economics'-এ পেশ করেন। এই গবেষণামূলক রচনাটির নাম হল *The Problem of Rupee: Its Origin and its Solution.* ১৮৩৫ সালে ভারতে প্রবর্তিত রৌপ্য মানের থেকে তিনি স্বর্ণমান-কে সমর্থন করেন। তিনি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক কেইনস কর্তৃক প্রস্তাবিত স্বর্ণবিনিময় মানকে সমর্থন করেননি।

উপরিউক্ত আর্থনীতিক বিষয়াদির বাইরে সীমাবদ্ধ কিছু বাছাই করা আর্থনীতিক বিষয়ে আম্‌বেদ্‌কার চিন্তাভাবনা করেছেন। কৃষি সম্পর্কিত বিষয়াদিতে তাঁর মূলত চতুর্বিধ বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। (ক) কৃষি

উৎপাদক ও রাষ্ট্রের মধ্যে যাবতীয় মধ্যস্বত্বভোগীর অবসান তিনি দাবি করেছেন। (খ) তিনি কৃষির জাতীয়করণের সুপারিশ করেছিলেন এবং তফসিলি জাতিসমূহের মধ্যে সকল উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের কথা বলেছিলেন। (গ) নিচু জাতের সকল সরকারি কর্মচারীর উপর আরোপিত ঐতিহ্যবাহী যাবতীয় দায়-দায়িত্বের অবসানের দাবি জানিয়েছিলেন এবং চুক্তিভিত্তিক দায়-দায়িত্বের কথা বলেছিলেন।

আমবেদকার ১৯৯৭ সালে 'Small Holdings in India and their Remedies' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি কৃষি জোতগুলিকে একত্রিত করার উপর জোর দেন। তবে কৃষিজোতের আয়তন বৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি নিঃশর্ত সমর্থন দেননি। এ বিষয়ে মতামতগত অবস্থান হল: "To a farmer a hilding is too small or too large for the other factors of production at his disposal necessary for carrying on the cultivation of his holding as an economic enterprise."

৯.৭ আমবেদ্‌কারের রাজনীতিক ভাবনা (Political Thought of Ambedkar)

উদারনীতিক রাষ্ট্রদর্শনের প্রভাব ॥ আমবেদ্‌কারের রাজনীতিক ভাবনার মূল তাঁর সামাজিক চিন্তা-চেতনা এবং আর্থনীতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে নিহিত আছে। বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য এবং মানবসমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা তাঁর রাজনীতিক ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিকদের উদারনীতিক গণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি আমবেদ্‌কারের অনুরাগ ছিল। পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। বিদেশি ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং প্রগতির সহায়ক সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে তিনি সমর্থন করেছেন। তবে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী যে কোন জাতির অস্তিত্বের স্বার্থে রাজনীতিক স্বাধীনতা ও নৈতিক দৃঢ়তার মধ্যে দ্বিতীয়টিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়। গুরুত্বের বিচারে তার পরেই আসে রাজনীতিক স্বাধীনতা। সামাজিক প্রগতির পরিপন্থী যাবতীয় প্রচলিত প্রথা ও সংস্কারের পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। এবং এই পরিবর্তন সাধনের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা, সক্ষমতা ও উদ্যোগ থাকা আবশ্যক। অন্যথায় সামাজিক সাম্যের আদর্শের অনুপন্থী জাতীয় রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করা অসম্ভব।

রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা ॥ রাষ্ট্র সম্পর্কিত আমবেদ্‌কারের ধারণা তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতানুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজের আজ্ঞাবহ হিসাবে ভূমিকা পালন করবে। রাষ্ট্র হবে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজের প্রভু নয়। রাষ্ট্র নিজেই নিজের লক্ষ্য নয়। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে ব্যক্তির জীবনে সুখ-স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করা। রাষ্ট্র সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্যকে বিলুপ্ত করবে। রাষ্ট্র ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধ সঞ্চারিত করবে এবং মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলবে। মার্কসবাদী দার্শনিকদের মত আমবেদ্‌কার রাষ্ট্রকে শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেননি। রাষ্ট্রকে তিনি নেতিবাচক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিপন্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতানুসারে রাষ্ট্র মানবিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সদর্থক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। তবে আমবেদ্‌কার সর্বাত্মক রাষ্ট্রের ধারণাকে সমর্থন করেননি। তিনি হেগেলীয় বা হবসীয় সর্বাত্মক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের ভাববাদী ধারণাকে অনুমোদন করেননি। আবার তিনি রাষ্ট্রকে দমনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিপন্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অর্থাৎ আমবেদ্‌কার রাষ্ট্র সম্পর্কিত মহাত্মা গান্ধীর নৈরাজ্যবাদী ধারণাকেও সমর্থন করেননি। প্রকৃত প্রস্তাবে আমবেদ্‌কার উদারনীতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা বলেছেন। তবে তিনি উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আড়ালে সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বের রাজনীতিকেও সমর্থন করেননি। শ্রেণী সহযোগিতার কথা বলে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন-শোষণ কায়েম করার রাজনীতিরও তিনি বিরোধিতা করেছেন।

গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি অনুরাগ ॥ আমবেদ্‌কার বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই সমাজে সাম্য ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হতে পারে। তাঁর অভিমত অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন ব্যতিরেকে কোন দেশ বা জাতির উন্নতিসাধন অসম্ভব। তিনি দায়িত্বশীল সরকারের কথা বলেছেন। এই সরকারের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থ সাধনে একনিষ্ঠভাবে আন্তরিক হবে। সরকারি ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ন্যায়বিচার ও যুক্তিসঙ্গতার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে বিদ্যমান সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করবে। আনুগত্য ও প্রতিবাদের মধ্যে সীমানা সম্পর্কে সরকারের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে সম্যক ধারণা থাকবে। আমবেদ্‌কার এই রকম এক সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৩০ সালে গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে আমবেদ্‌কার এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ভারতে আমলাতান্ত্রিক সরকারের অবসান অপরিহার্য। এ দেশের সরকার হবে জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য। তিনি এও বলেছেন যে ব্রিটিশ সরকার যতদিন থাকবে রাজনীতিক ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে আসবে না। একমাত্র স্বরাজ-সংবিধানের আওতায় রাজনীতিক ক্ষমতা দেশের মানুষের হাতে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

এবং এ ছাড়া এ দেশের মানুষের মুক্তি সাধন সম্ভব নয়। বস্তুত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি আমবেদ্‌কারের অনুরাগ ছিল আন্তরিক। ড. ভর্মা এ বিষয়ে বলেছেন: "Ambedkar was realistic in pointing out that the Indian bureaucracy which shared the prejudices of the Hindus against the Untouchables was responsible for the owes of the Untouchables."

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ॥ গণতান্ত্রিক রাজনীতিক মতাদর্শের উপর অগাধ আস্থার ভিত্তিতে আমবেদ্‌কার গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিচারে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ব্যতিরেকে যথার্থ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সামাজিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডল যদি অগণতান্ত্রিক হয় তা হলে সরকারও অগণতান্ত্রিক হতে বাধ্য। আমবেদ্‌কার গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধারণা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতানুসারে গণতন্ত্র শুধুমাত্র একটি সরকার নয়, তারও অধিক কিছু। রাষ্ট্র হল সমাজের সংগঠনের একটি কাঠামো। আমবেদকার গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত সমাজের দুটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এই দুটি বৈশিষ্ট্য হল: (ক) সমাজে শ্রেণীগত স্তরবিন্যাসের অনুপস্থিতি এবং (খ) স্বার্থজনিত পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিনিয়ত পুনর্বিন্যাস বা স্বীকৃতির ব্যাপারে ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠীসমূহের সামাজিক অভ্যাস। বিচ্ছিন্নতা এবং পৃথক করার প্রবণতা গণতন্ত্রের বিরোধী। এর ফলে স্বতন্ত্র দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। একটি শ্রেণী সুবিধাপ্রাপ্ত এবং অন্য শ্রেণীটি সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী ভারতীয় সমাজ যদি বিভিন্ন শ্রেণী ও উপ শ্রেণীতে বহুধা বিভক্ত থাকে তা হলে গণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমেও কোন সুফল পাওয়া যাবে না। কারণ এ ধরনের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যক্তিমাত্রেই শ্রেণী-স্বার্থকেই সবকিছুর উপর স্থান দেবে। এ রকম সমাজব্যবস্থায় সরকারের কাজকর্মে পরিচ্ছন্নতা ও ন্যায়বিচার থাকবে না। গণতান্ত্রিক সরকার শুধুমাত্র জনগণের ও জনগণের দ্বারা হলেই হবে না, একে জনগণের সরকার হতে হবে। আমবেদ্‌কার আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, গণতন্ত্র শুধুমাত্র একটি সামাজিক ব্যবস্থা নয়, তার থেকেও অধিক কিছু। গণতন্ত্র হল একটি জীবনদর্শন, একটি মনোভঙ্গি। গণতন্ত্রের জন্য গণতান্ত্রিক মনোভঙ্গি এবং সঠিক সামাজিকীকরণ আবশ্যক। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী ব্যক্তিবর্গের মানসিক গঠনবিন্যাস গণতান্ত্রিক হওয়া দরকার। অন্যথায় গণতান্ত্রিক সরকার সহজেই একটি বিপজ্জনক সরকারে পরিণত হতে পারে। আমবেদ্‌কারের মতানুসারে সামাজিক স্বাধীনতার আগে রাজনীতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ কথা ঠিক। কিন্তু দেশে যদি গণতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো না থাকে, তা হলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না।

প্রচলিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিকে সমর্থন করেননি ॥ প্রচলিত অর্থে গণতন্ত্র বলতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার ফলে চূড়ান্ত বিচারে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এই প্রচলিত ধারণাকে আমবেদ্‌কার স্বীকার বা সমর্থন করেননি। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তার ফলে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগত বিচারে একটি জনসম্প্রদায় অন্য জনসম্প্রদায়ের উপর রাজনীতিক কর্তৃত্ব কায়েম করে। প্রচলিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা গুরুত্ব লাভ করে আমবেদ্‌কার তাকে রাজনীতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলতে রাজি নন। তাঁর মতানুসারে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হল সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা জন্ম লাভ করে, একে তৈরি করা হয় না বা যায় না। রাজনীতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়। অথচ এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হল নির্দিষ্ট ও স্থায়ী প্রকৃতির। স্বভাবতই এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে রাজনীতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলা যায় না। ভারতের অসংখ্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে আমবেদ্‌কার এ দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি অনুসরণ করা হয় তা হল প্রধানত জাতগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অনুরূপভাবে এ দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সংখ্যালঘুর কথা বলা হয় তাও হল জাতগত সংখ্যালঘু। সুতরাং ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সংখ্যালঘিষ্ঠতা উভয়ই হল স্থায়ী প্রকৃতির। আমবেদ্‌কার ভারতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু ভোটদাতাদের মধ্যে আনুপাতিক ব্যবধান হ্রাস করার বিষয়ে ভেবেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংখ্যাগুরুর চেয়ে সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকারের বয়স হ্রাসের সুপারিশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে, সংখ্যালঘুর ভোটাধিকারের মান-মর্যাদা সংখ্যাগুরুর সমপর্যায়ের হওয়া দরকার।

সংখ্যালঘুদের জাতির মূল স্রোতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা ॥ আমবেদ্‌কার ভারতের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মূল স্রোত থেকে স্বতন্ত্র করতে চাননি, বরং মূল স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়সমূহকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় এবং দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। অনগ্রসর ও অসহায় সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়সমূহের প্রতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মানবিকতা ও

সহানুভূতিকে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে আমবেদ্‌কার আন্তরিক ছিলেন। পশ্চাদ্‌পদ সংখ্যালঘু সাধারণ মানুষগুলি সমগ্র দেশ ও জাতির চোখে স্বতন্ত্র কোন জনসম্প্রদায় নয়, এটাই প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে আমবেদ্‌কার উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছেন। বিশাল ভারতভূমিতে বহু ও বিভিন্ন জনসম্প্রদায় বসবাস করে। জীবনধারাগত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সমাজব্যবস্থা অতিমাত্রায় জটিল প্রকৃতির। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী ছোট-বড় নির্বিশেষে কোন জনগোষ্ঠীই দেশের অন্যান্যদের ভালমন্দের বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তা ছাড়া কোন বিশেষ একটি অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী অঞ্চলের সকলের স্বার্থের সম্যক প্রতিনিধিত্ব করতে সমর্থ নয়। এ ধরনের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সন্তোষজনক হতে পারে না। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবস্থা সংখ্যালঘুদের স্বার্থের সহায়ক নয়।

তফসিলি জাতিসমূহের সংরক্ষণমূলক সুবিধাকে স্থায়ী করতে চাননি ॥ আমবেদ্‌কার তফসিলী জাতিগুলিকে স্থায়ীভাবে স্বতন্ত্র একটি জনসম্প্রদায় হিসাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাননি। চিরকালের জন্য তফসিলি এই মানবগোষ্ঠী সংসদে ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে আসন সংরক্ষণের এবং সরকারি চাকরিতে পদ সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করবে, এ অভিপ্রায় আমবেদকারের ছিল না। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন যে, সংরক্ষণমূলক এই সমস্ত সুবিধা সীমিত সময়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া দরকার। জাতগত বিচারে বৈষম্যমূলক আচরণ সাংবিধানিকভাবেই নিষিদ্ধ করা আবশ্যক। তা হলেই অনতিবিলম্বে তফসিলি জাতিসমূহ দেশের অন্যান্য উন্নত জনসম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারবে। আমবেদ্‌কার ভারতীয় সমাজকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করার বিরোধী ছিলেন। তিনি সব সময় একটি অবস্থা বা সময়ের ব্যাপারে দৃঢ় আশা পোষণ করেছেন যখন তফসিলি জাতিসমূহ ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সংরক্ষণমূলক বিশেষাধিকার তফসিলি জাতিসমূহের মধ্যেই স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করবে এবং এই শ্রেণীটিই সংরক্ষণমূলক সুযোগ-সুবিধাকে স্থায়ীকরণের ব্যাপারে সর্বপ্রকারে উদ্যোগী হবে। এই কারণে ১৯৫৫ সালের ১৩ অক্টোবর আমবেদ্‌কার তফসিলি জাতিসমূহের নেতৃবর্গের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে তফসিলি জাতিসমূহের জন্য সংরক্ষিত আসনের সুযোগ-সুবিধার বিলোপ সাধনের দাবি উত্থাপন করা উচিত। কারণ এ বিষয়ে উপযুক্ত সময় এসে গেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের সমর্থক ॥ আমবেদ্‌কার সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমর্থনে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতানুসারে জনপ্রিয় সরকারের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সংসদীয় গণতন্ত্রে বর্তমান। ভারতের জন্য তিনি ব্রিটিশ মডেলের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন। ভারতের সংবিধানে ব্রিটেনের পার্লামেণ্টীয় শাসনব্যবস্থার রূপরেখাকে অনুসরণ করার উপর জোর দিয়েছেন। আমবেদ্‌কার সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত তিনটি সদর্থক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এগুলি হল: **এক**, সংসদীয় গণতন্ত্রে বংশানুক্রমিক শাসন অস্বীকৃত; **দুই**, সংসদীয় গণতন্ত্রে জনজীবন নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-ব্যবস্থাসমূহ জনসাধারণের দ্বারা অনুমোদিত হয়; এবং **তিন**, জনসাধারণের আস্থা ব্যতিরেকে শাসকবর্গ ক্ষমতাসীন থাকতে পারে না। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার মাধ্যমে জনসাধারণের মতামতের অভিব্যক্তি ঘটে। শাসন-বিভাগ আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে এবং আইনসভার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনুগামী হয়। শাসন-বিভাগ ও আইনসভার উর্ধ্বে থাকে আদালত। আদালত উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংবিধানে স্বীকৃত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। তার ফলে জনপ্রিয় সরকার সুনিশ্চিত হয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য উদ্যোগ ॥ আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী সাম্য গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্বাধীনতার জন্য আবেগের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। অথচ সাম্যের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রে তেমন কোন মাথাব্যথা দেখা যায় না। সাম্যের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্ক সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সংসদীয় গণতন্ত্রে তেমন কোন উদ্যোগ-আয়োজন দেখা যায় না। সাম্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে মূল্য দেওয়া হয় না। এমনকী স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে কার্যকর ভারসাম্য সৃষ্টির উদ্যোগও থাকে না। তার ফলে স্বাধীনতা সাম্যকে গিলে ফেলে। বস্তুত সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমবেদ্‌কার অবহিত ছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের সংবিধানে সাম্য ও স্বাধীনতা স্বীকৃত থাকে। কিন্তু সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ব্যতিরেকে সংসদীয় গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসন্তোষ-বিক্ষোভও থাকে। ভারতের জনসাধারণ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী ও জাতভেদ প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে শতধা বিভক্ত। স্বভাবতই আমবেদ্‌কার সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। এই কারণে তিনি দলিত শ্রেণীসমূহের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি জানিয়েছেন। ভারতের সংবিধান রচনাকারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে আমবেদ্‌কার দলিত শ্রেণীসমূহের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক অধিকারসমূহের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সাধ্যমত উদ্যোগ আয়োজন গ্রহণ করেছেন।

সৌভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ ॥ আমবেদ্‌কার ফরাসী বিপ্লবের বক্তব্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের স্বার্থে সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতানুসারে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক আদর্শের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেশবাসীকে সাম্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব অনুধাবন ও অনুসরণ করতে হবে। গণতন্ত্রে সাম্য ও স্বাধীনতার সাংবিধানিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং জাতভেদ প্রথা সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। তার ফলে গণতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি বিপন্ন হয়ে পড়ে। আমবেদ্‌কারের মতানুসারে আমরা সকলে অভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্বের রীতিনীতির অংশীদার। সুতরাং গণতন্ত্র ব্যতিরেকে কোনরকম সংঘবদ্ধ জীবন সম্ভব হতে পারে না। অর্থাৎ সংঘবদ্ধ জীবনযাপন সম্ভব করে তোলার স্বার্থে সকলের জন্য গণতন্ত্র বাধ্যতামূলক। সৌভ্রাতৃত্ব হল যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এবং সৌভ্রাতৃত্ব বলতে বোঝায় যথার্থ এক ধর্মীয় ভাবকে। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী সৌভ্রাতৃত্ব-বর্জিত সাম্য স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে এবং স্বাধীনতা সাম্যকে ধ্বংস করে। এই কারণে আমবেদ্‌কার গণতন্ত্রের সাফল্যের স্বার্থে সৌভ্রাতৃত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাদি ॥ আমবেদ্‌কার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের শর্তাবলী সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। গণপরিষদে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের স্বার্থে কতকগুলি শর্তকে অপরিহার্য বলে চিহ্নিত করেছেন। এই অপরিহার্য শর্তসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। **এক**, গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষকে পাঁচ বছরের পর ক্ষমতাসীন থাকার জন্য জনাদেশ নিতে হবে। অনুকূল জনাদেশ না পেলে ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষকে পাঁচ বছরের পরেই গদি ছাড়তে হবে। আমবেদ্‌কার এই ব্যবস্থাকে পাঁচ বছরের দীর্ঘমেয়াদী ভেটো হিসাবে অভিহিত করেছেন। **দুই**, গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের অস্তিত্ব অপরিহার্য। **তিন**, আইন ও প্রশাসনের চোখে সকলের জন্য সাম্যের স্বীকৃতি দরকার। **চার**, সাংবিধানিক নৈতিকতার আচরণ গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে পরিগণিত হয়। **পাঁচ**, গণতন্ত্রের নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের আচরণ স্বৈরাচারমূলক হওয়া চলবে না। **ছয়**, দেশ ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষমতাসীন দলকে সকল রকম প্রলোভনের উর্ধ্বে উঠতে হবে। **সাত**, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্র পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তি হবে কর্তব্যপরায়ণ ও আস্থাশীল। অনুরূপভাবে ব্যক্তির ব্যাপারে রাষ্ট্র হবে দায়িত্বসচেতন ও শ্রদ্ধাশীল। জাতভেদ বা ধর্মীয় কারণে কোন একটি সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচারমূলক আচরণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হয়ে এ ধরনের অন্যায়-অবিচারের মোকাবিলা করতে হবে।

ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ ॥ আমবেদ্‌কার ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতই গোষ্ঠীর পরিবর্তে ব্যক্তির উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমাজব্যবস্থার একক ও কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে তিনি ব্যক্তির কথাই বলেছেন। আমবেদ্‌কার ছিলেন স্বাধীন ভারতের সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি। এই সুবাদে খসড়া সংবিধানে তিনি গ্রামের পরিবর্তে ব্যক্তিকেই একক হিসাবে স্বীকার করেছেন। তিনি গ্রামীণ সমাজের পুনর্গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রামকে তিনি সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা ও অজ্ঞতার আখড়া হিসাবে মনে করতেন। তবে আমবেদ্‌কার ক্ষমতার আঞ্চলিক বিভাগের বা বিকেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করেননি। তিনি আঞ্চলিক স্বার্থ বা স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্বকে উপেক্ষা করেননি। তিনি ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী ছিলেন। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মাথায় রেখেই আমবেদ্‌কার শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলেছেন।

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের নীতি ॥ আমবেদ্‌কার ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের নীতিকে সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি ভাষাভিত্তিক অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাকে রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের বিরোধিতা করেছেন। ভারত হল বহু ভাষাভাষী জনসম্প্রদায়সমূহের এক বিশাল দেশ। ভাষাগত বিভিন্নতার কারণে আঞ্চলিক চাপ ও টানা-পোড়েন ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। এ বিষয়ে আমবেদ্‌কার সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতানুসারে এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রের কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদনের সহায়ক। আবার এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতগত ও কৃষ্টিগত উত্তেজনা প্রশমিত করা সম্ভব হবে। তা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেও তিনি ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের নীতি ও ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি প্রদানের বিরোধিতা করেছেন। আঞ্চলিক ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকার করে নিলে ভাষাভিত্তিক অঙ্গরাজ্যসমূহ অধিকতর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সামিল হতে পারে। এবং তার ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। এই আশঙ্কা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আমবেদ্‌কার চেয়েছিলেন যে, আঞ্চলিক ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে

কখনই স্বীকার করা হবে না, এই মর্মে সংবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ থাকা দরকার। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী একটি ভাষা জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি করে এবং দুটি ভাষা বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে। সাংস্কৃতিক সংহতি ভাষাগত ঐক্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব। ভারতীয়রা ঐক্য, সংহতি ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পক্ষপাতী। স্বভাবতই সকল ভারতীয়ের বাধ্যবাধকতামূলক দায়িত্ব হল হিন্দিকে তাদের নিজেদের ভাষা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া। হিন্দিকে জাতির সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া দরকার। তবে হিন্দি সরকারি ভাষা হিসাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত ইংরেজি সরকারি ভাষা হিসাবে বহাল থাকবে। আমবেদ্‌কারের মতানুসারে দেশের অখণ্ডতা এবং দেশবাসীর ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে এই নীতি মেনে নেওয়া দরকার। এ দেশের কোন মানুষ যদি এই নীতির অনুগামী হতে অরাজি হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজেকে ভারতীয় হিসাবে দাবি করার অধিকার থাকতে পারে না। এ ধরনের মানুষ সামগ্রিক বিচারে একশোভাগ তামিল বা অসমীয়া হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বিচারে ভারতীয় হতে পারে না। ভারতের অখণ্ডতার জন্য প্রত্যেক ভারতীয়কে হতে হবে প্রথমে ভারতীয় এবং শেষেও ভারতীয়।

মূল্যায়ন (Evaluation)

আমবেদ্‌কারের রাজনীতিক জীবন সুদীর্ঘ চার দশকেরও অধিককালব্যাপী পরিব্যাপ্ত। তাঁর রাজনীতিক মতাদর্শ ও কর্মকাণ্ড সব সময় সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক-বিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন।

এক, সংখ্যালঘু রাজনীতির সূত্রপাত ॥ বর্তমান ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু রাজনীতির ক্ষতিকারক দিকগুলির কথা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত নির্বাচনী রাজনীতিতে সংখ্যালঘু রাজনীতির বিরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। সমালোচকদের অভিযোগ অনুযায়ী আমবেদ্‌কারই ভারতীয় রাজনীতিতে সংখ্যালঘু রাজনীতির মূল ধারাটির সূত্রপাত করেছেন। তিনি দেশ ও দেশবাসীর স্বাধীনতার জন্য বৃহত্তর সংগ্রাম থেকে সরে গিয়েছেন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগঠনের সামিল হয়েছেন।

দুই, কেবল আইনমূলক উপায় অবলম্বন ॥ আমবেদ্‌কর তাঁর রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে আইনমূলক উপায়-পদ্ধতির উপর মাত্রারিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে এবং নিপীড়িত জনসম্প্রদায়সমূহের মানবিক অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তিনি আন্তরিক ছিলেন। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু সনাতন ভারতের হিন্দু-সমাজের সুদীর্ঘকালের সামাজিক কুসংস্কারসমূহের আশু অবসান নিছক আইনি পথে অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটিগুলি ভেঙে ফেলা দরকার, সচেতন জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে কঠিন-কঠোর গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। কারণ এ ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি আইনমূলক নয়, সামগ্রিক বিচারে সামাজিক। আমবেদ্‌কার কিছু সমকালীন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য মূলত আইনমূলক উপায়-পদ্ধতিকে আশ্রয় করেছেন।

তিন, হিন্দুবিদ্বেষ ॥ সমালোচকদের মতানুসারে আমবেদ্‌কারের হিন্দুবিদ্বেষ প্রবলভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। হিন্দু সামাজিক সংগঠন, বিধি-ব্যবস্থা এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি আমবেদ্‌কারের বিরোধী মনোভাব পল্লবিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুদের প্রতি এ ধরনের বিদ্বেষ-বিরোধিতা সকলে ভাল চোখে দেখেননি। অভিযোগ করা হয় যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তিনি ততটা সোচ্চার ছিলেন না। বিদেশি ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আমবেদ্‌কারকে আশানুরূপভাবে মুখর হতে দেখা যায়নি। তাঁর তীব্র হিন্দুবিদ্বেষ বিরূপ সমালোচনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চার, সামাজিক সংস্কারকে অধিক গুরুত্ব প্রদান ॥ আমবেদ্‌কার পরাধীন ভারত ও ভারতবাসীর রাজনীতিক স্বাধীনতার থেকে সমকালীন সামাজিক সমস্যাদির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অথচ পরাধীন জাতির ক্ষেত্রে রাজনীতিক স্বাধীনতা অর্জনই আগে আবশ্যক। কারণ পরাধীন জাতির প্রগতিমূলক সামাজিক সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী সরকার সহায়ক বা সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবে না। এটাই স্বাভাবিক। আমবেদ্‌কার কিন্তু এই স্বাভাবিক বিষয়টিকে স্বীকার করে নিয়ে দেশ ও দেশবাসীর রাজনীতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। রাজনীতিক স্বাধীনতার থেকে তিনি সামাজিক সংস্কারকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

পাঁচ, স্বাধীনতা সংগ্রামে সীমাবদ্ধ ভূমিকা ॥ আমবেদ্‌কার অনগ্রসর শ্রেণী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পশ্চাদ্‌পদ জনগোষ্ঠীগুলির উপর আরোপিত শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যাপারে আমবেদ্‌কার ছিলেন অতিমাত্রায় আন্তরিক। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জনের মূল লক্ষ্য থেকে তিনি বহুলাংশে বিচ্যুত

হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বৃহত্তর কর্মযজ্ঞের সুপ্রসারিত প্রেক্ষাপটে আমবেদ্‌কারের ভূমিকা ছিল সংকীর্ণতা-দোষে দুষ্ট। সুতরাং ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলনে আমবেদ্‌কারের ভূমিকা বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়।

ছয়, ভূমিকার দুর্বলতা ॥ আমবেদ্‌কার অবহেলিত ও অনগ্রসর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাদের প্রতিনিধিত্ব ও সংরক্ষণমূলক সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে সাংবিধানিক বা আইনমূলক উপায়-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তাঁর এই উদ্যোগ সমকালীন সামাজিক রাজনীতিক সমস্যাদির সম্যক সমাধানের সহায়ক ছিল না। তা ছাড়া এ পথে পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীসমূহের সমস্যাদির স্থায়ী বা বাস্তবসম্মত সমাধান সম্ভবপর ছিল না।

উপসংহার ॥ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আমবেদ্‌কার মানবিক স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরণ সংগ্রামের সামিল হয়েছেন। ভারতের দীন-দরিদ্র, পশ্চাদ্‌পদ ও নিপীড়িত মানুষের জন্য আমবেদ্‌কারের আন্তরিকতা অনস্বীকার্য। রাজনীতিক উচ্চাশা অথবা কায়েমী স্বার্থের প্রলোভন তাঁকে তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। জহরলাল নেহরুর মতানুসারে আমবেদ্‌কার হলেন সকল রকম দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি। দেশ ও দেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থে তিনি বিচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন, সমালোচকদের এ ধরনের অভিযোগ অমূলক। ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা তাঁর *Modern Indian Political Thought* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন: "There is no doubt that he was a patriot and would not be opposed to national integration. Nobody can be opposed to his views that for the untouchables, the liberation from the degrading humiliations imposed by Hinduism was a matter of more urgent necessity than even the political liberation from the alien British rule." তিনি আরও মন্তব্য করেছেন: ".....Ambedkar deserves the credit for having made Hindus aware of the great tension-generating social problems which must be tackled, otherwise they may eventually to bring about the doom not only of the Hindu society but of the total Indian political system as well. In order to clothe the fabric of modern political system with legitimacy, it is essential that people who have been suppressed for centuries are given their legal rights and become equal citizens in all spheres of life."

৯.৮ মহাত্মা গান্ধী ও আমবেদ্‌কার (Mahatma Gandhi and Ambedkar)

মহাত্মা গান্ধী এবং আমবেদ্‌কারের মধ্যে রাজনীতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। অথচ এই বিরোধিতা আপাতবিচারে অহেতুক প্রতীয়মান হয়। কারণ উদ্দেশ্যগত বিচারে উভয়ের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। উভয়েই সকলের জন্য ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার কথা বলেছেন। এবং এ বিষয়ে জাত, ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষগত বৈষম্যের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা সংগঠনের উপায়-পদ্ধতি প্রসঙ্গে গান্ধীজি ও আমবেদ্‌কারের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য ছিল।

বর্ণাশ্রমের ব্যাপারে মতবিরোধ ॥ বর্ণ-ব্যবস্থা, জাতভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ও আমবেদ্‌কারের মধ্যে ধারণাগত গুরুতর মতানৈক্য ছিল। জাতভেদ ব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজি তাঁর ধারণা বা মতামত হরিজন পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। আমবেদ্‌কার গান্ধীজির এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে স্বীকার বা সমর্থন করেননি। মহাত্মার মতানুসারে জাত-ব্যবস্থা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত। জাতকে তিনি একটি প্রথা হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন এই প্রথার উৎস সম্পর্কে অবহিত নন এবং তিনি এও বলেছেন যে, জাত-প্রথার উৎস অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও তিনি মনে করেন না। তবে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, জাত-প্রথা আধ্যাত্মিক ও জাতীয় বিকাশের পরিপন্থী। গান্ধীজির মতানুসারে বর্ণ ও আশ্রম হল প্রতিষ্ঠান। জাত-প্রথার সঙ্গে বর্ণাশ্রম সম্পর্ক-রহিত। পূর্বপুরুষের পেশার ভিত্তিতে আমরা প্রত্যেকে আমাদের জীবিকার্জন করি। বর্ণব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী আমরা এই শিক্ষা লাভ করি। বর্ণাশ্রমের বিধান অধিকারের পরিবর্তে আমাদের দায়িত্ব সচেতন করে তোলে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সকলেই ভাল, আইনানুগ এবং পুরোপুরি সমমর্যাদাসম্পন্ন। কোন বিশেষ বর্ণ কর্তৃক অন্য বর্ণের উপর উচ্চতর মর্যাদার অধিকার দাবি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার বিধানের বিরোধী। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিধানে কোথাও অস্পৃশ্যতার কথা বলা হয়নি। বর্ণাশ্রম ও জাতপাত সম্পর্কিত গান্ধীজির অভিমতকে আমবেদ্‌কার স্বীকার বা সমর্থন করেননি। বরং তিনি এ বিষয়ে গান্ধীজির বিরোধিতা করেন। আমবেদ্‌কার অভিমত অনুযায়ী জাতপাতের

ব্যবস্থা হিন্দু সমাজকে চূড়ান্ত অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দিয়েছে। সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতির স্বার্থে হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন প্রয়োজন। বর্ণ ও জাতপাতের ব্যবস্থার সমর্থনে ধর্মীয় স্বীকৃতির ব্যবস্থার অবসান আবশ্যক। বর্ণ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন অসম্ভব। কারণ এর থেকেই জাতভেদ প্রথার মত হানিকর একটি প্রথার উদ্ভবের আশঙ্কা থাকে। চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা আর এক দিক থেকে জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী প্রতিপন্ন হতে পারে। কারণ চতুর্বর্ণের ব্যবস্থায় জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জ্ঞানার্জনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। বর্ণ ও জাতব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ সম্পর্কের কাঠামো ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। আমবেদ্‌কার বলেছেন: "A society based on varna or caste is a society which is based on a wrong relationship. I had hoped that Mahatma would attempt to demolish my argument but instead of doing that he has merely reiterated his belief in Chaturvarnya without disclosing the ground on which it is based."

দলিতদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে মতানৈক্য ॥ আমবেদ্‌কার ন্যায়, স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এই পথে হিন্দুসমাজ থেকে জাতপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ অবসান সম্ভব হবে। হিন্দু সমাজের এ ধরনের পুনর্গঠন ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে আমবেদ্‌কার মুসলমানদের মত দলিত শ্রেণীকেও পৃথকভাবে রাজনীতিক অধিকার প্রদানের এবং স্বতন্ত্র জনসম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের কথা বলেছেন। অপরদিকে গান্ধীজি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। কিন্তু তিনি অস্পৃশ্য মানবগোষ্ঠীর স্বার্থে বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেননি। গান্ধীজি অস্পৃশ্যতার অবসানের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বর্ণ হিন্দুদের বিরাগভাজন হয়ে এ কাজ করতে চাননি। দলিত শ্রেণীসমূহের অধিকারের ব্যাপারে মহাত্মার স্বতন্ত্র মতামত ছিল। তাঁর হরিজন সেবক সংঘ জাতপ্রথার বিলুপ্তির বিষয়টিকে সংঘের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়নি।

পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপারে মতপার্থক্য ॥ দলিত শ্রেণীসমূহের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণের প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমবেদ্‌কারের মৌলিক মতপার্থক্য ছিল। আমবেদ্‌কার খোলাখুলি জানিয়েছিলেন যে হিন্দু এবং দলিত শ্রেণীসমূহকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জনসম্প্রদায় হিসাবে স্বীকার করতে হবে। কারণ হিন্দুদের সঙ্গে দলিত শ্রেণীসমূহের কোন রকম সংযোগ-সম্পর্ক নেই। ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন করে। ১৯৩০ সালে লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন বসে। আমবেদ্‌কার উভয় ক্ষেত্রেই দলিত শ্রেণীসমূহের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী দাবি করেছেন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন আমবেদ্‌কার আনুপাতিক হারে সকল জনসম্প্রদায়কে রাজনীতিক ক্ষমতার অংশীদার হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার উপর জোর দেন। দলিত শ্রেণীসমূহের জন্য বিভিন্ন রাজনীতিক অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আমবেদ্‌কার মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি ভারতের সংখ্যালঘু শ্রেণীসমূহের দৃষ্টিভঙ্গিকে মর্যাদা দেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে আমবেদ্‌কারের এই সংযোগ-সম্পর্কের বিষয়টিকে গান্ধীজি ভাল চোখে দেখেননি। তিনি প্রবলভাবে এর প্রতিবাদ করেন। অস্পৃশ্যদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনীতিক অধিকারের দাবিকে তিনি স্বীকার বা সমর্থন করেননি। বরং অস্পৃশ্যরা ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান হলে তাতে তিনি আপত্তির কিছু দেখেননি।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণে চুক্তি ॥ দলিত শ্রেণীসমূহের জন্য রাজনীতিক অধিকার আদায়ের উদ্যোগের ক্ষেত্রে আমবেদ্‌কার মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। অস্পৃশ্যদের জন্য রাজনীতিক অধিকারের ব্যবস্থাকে রোখবার ব্যাপারে গান্ধীজি প্রকাশ্যেই তাঁর অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। ১৯৩২ সালের ২৩ মে তারিখে পুণেতে সর্বভারতীয় অস্পৃশ্যতা লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে আমবেদ্‌কার অস্পৃশ্যদের জন্য মন্দির, কূপ, জলাধার নির্মাণ বা অসবর্ণ পঙক্তি-ভোজনের ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন নি। তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য দাবি করেছেন সরকারি চাকরি, শিক্ষার ব্যবস্থা, খাদ্য, পরিধেয় ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award of 1932) মাধ্যমে দলিত শ্রেণীসমূহের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি আদায়ে আমবেদ্‌কার কৃতকার্য হন। গান্ধীজি এর বিরোধিতা করেন। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় সংখ্যালঘু এবং অস্পৃশ্যদের জন্য প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থারও তিনি বিরোধিতা করেন। মহাত্মা গান্ধীর অভিমত অনুযায়ী অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের কলঙ্কস্বরূপ। এই কলঙ্কের অপনোদন আবশ্যক। স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর স্বীকৃতি হিন্দু ধর্মের এই কলঙ্ককে স্থায়িত্ব প্রদান করবে। অস্পৃশ্যরা স্থায়ীভাবে অস্পৃশ্য থেকে যাবে। সমাজে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রকৃতির সমস্যার সৃষ্টি হবে। গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র বিরোধিতা করলেন। তিনি আমরণ অনশনে বসলেন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ল। মহাত্মা গান্ধীর জীবন রক্ষার জন্য কংগ্রেসের জাতীয় নেতারা আসরে অবতীর্ণ হলেন। আমবেদ্‌কারের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন এবং আপস-মীমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। হিন্দুদের সঙ্গে

দলিতদেরও যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার জন্য আমবেদ্‌কারকে তাঁরা রাজি করালেন। দলিত শ্রেণীসমূহের পক্ষে আমবেদ্‌কার কংগ্রেস দলের সঙ্গে পুণে চুক্তি সম্পাদন করলেন ১৯৩২ সালে ২৪শে সেপ্টেম্বর। বিখ্যাত পুণে চুক্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় দশ বছরের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই চুক্তিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থাকে বাতিল করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পুণে চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অস্পৃশ্যদের জন্য আন্দোলনের ব্যাপারে মতভেদ ॥ হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতার অবসানের ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী আন্তরিক ছিলেন। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু তিনি চতুর্বর্ণের মূল ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে গান্ধীজির সঙ্গে আমবেদ্‌কারের মতাদর্শগত মৌলিক পার্থক্য ছিল। আমবেদ্‌কারের অভিমত অনুযায়ী অস্পৃশ্যরা হল জাতভেদ প্রথারই ফসল। জাতপাতের ব্যবস্থা যতদিন থাকবে, অস্পৃশ্যদের অস্তিত্বও ততদিন অব্যাহত থাকবে। জাতপাতের ব্যবস্থার বাতিলকরণ ব্যতিরেকে অস্পৃশ্যতার অবসান অসম্ভব। আমবেদ্‌কারের এই অভিমতকে গান্ধীজি স্বীকার বা সমর্থন করেননি। অস্পৃশ্যতাকে তিনি জাতভেদ প্রথার সৃষ্টি হিসাবে স্বীকার করেননি। হিন্দুবাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের ধারণাই হল অস্পৃশ্যতার উদ্ভবের উৎস। এবং এই অস্পৃশ্যতাই হিন্দু সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ের মূল কারণ। মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সর্বভারতীয় অস্পৃশ্যতা-বিরোধী লিগ গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই লিগের নামকরণ হয় 'হরিজন সেবক সংঘ'। হরিজন সেবক সংঘের পরিচালন সমিতিতে দলিত শ্রেণীর নেতাদের নেওয়া হয়নি। তা ছাড়া এই সংগঠনের কর্মসূচীর ব্যাপারেও আমবেদ্‌কারের আপত্তি ছিল। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের এই আন্দোলনকে আমবেদ্‌কার স্বীকার বা সমর্থন করেননি। আমবেদ্‌কার প্রস্তাব করেছিলেন যে দলিত শ্রেণীসমূহের সামাজিক, আর্থনীতিক ও শিক্ষা সম্পর্কিত উন্নয়নের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আমবেদ্‌কারের প্রস্তাবকে কংগ্রেস দল গুরুত্ব দেয়নি।